আকাইদ ও ফিকহ

العقائد والفقه

দাখিল

সপ্তম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আকাইদ ও ফিকহ্

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

রচনা
ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনা
মাওলানা রূহুল আমীন খান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.
পরিমার্জিত সংস্করণ : , ২০১৯ খ্রি.

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প ২০২১** এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : আল আকাইদ

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আল আকাইদ	১	৬ষ্ঠ অধ্যায়	ফেরেশতাদের প্রতি ইমান	৩৩
১ম পাঠ	সহিহ আকিদার গুরুত্ব	১	১ম পাঠ	আল কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাদের কার্যক্রম	৩৩
২য় পাঠ	ভ্রান্ত আকিদার কুফল	২	২য় পাঠ	কিরামান কাতেবিনের কাজ	৩৫
২য় অধ্যায়	আদ দীন	৬	৩য় পাঠ	মুনকার ও নকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব	৩৫
১ম পাঠ	দীনের পরিচয় ও মৌলিক দিক	৬	৭ম অধ্যায়	কিতাবসমূহের প্রতি ইমান	৩৯
২য় পাঠ	ইমানের শাখাসমূহ	৭	১ম পাঠ	আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমানের গুরুত্ব	৩৯
৩য় পাঠ	তাযকিয়ার পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৮	২য় পাঠ	আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব	৪০
৩য় অধ্যায়	আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৩য় পাঠ	আল কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম	৪১
১ম পাঠ	কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান	১২	৮ম অধ্যায়	আখেরাতের প্রতি ইমান	৪৫
২য় পাঠ	সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইমান	১৩	১ম পাঠ	চিরস্থায়ী আখেরাত জীবনে মুক্তির আশা	৪৫
৪র্থ অধ্যায়	আত তাওহীদ	১৬	২য় পাঠ	আমলনামা ও হাউযে কাউসার	৪৬
১ম পাঠ	তাওহিদের স্তরসমূহ	১৬	৯ম অধ্যায়	তাকদিরের প্রতি ইমান	৫০
২য় পাঠ	আল আসমাউল হুসনা	১৭	১ম পাঠ	তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস	৫০
৩য় পাঠ	আল্লাহর ইবাদত	২১	২য় পাঠ	তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম	৫১
৫ম অধ্যায়	নবি-রসুলগণের প্রতি ইমান	২৬	১০ম অধ্যায়	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি আকিদা	৫৪
১ম পাঠ	আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রসুল	২৬	১ম পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় ও মর্যাদা	৫৪
২য় পাঠ	নবি ও রসুলের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য	২৮	২য় পাঠ	সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন	৫৫
৩য় পাঠ	রসুলুল্লাহ (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি	২৯	৩য় পাঠ	সাহাবিগণ সমালোচনার উর্ধ্বে	৫৬

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্

১ম অধ্যায়	ইলমে ফিকহের ইতিহাস	৫৯	১ম পাঠ	আহকামুস সালাত	৯০
১ম পাঠ	ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা	৫৯	২য় পাঠ	সালাতের কিরাআত	৯৮
২য় পাঠ	মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	৬০	৩য় পাঠ	কাযা সালাত	৯৯
৩য় পাঠ	ইমামগণের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৬১	৪র্থ পাঠ	সালাতুল বেতের	১০৪
২য় অধ্যায়	নাজাসাত	৬৬	৫ম পাঠ	জানাযা সালাত	১০৮
১ম পাঠ	নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ	৬৬	৬ষ্ঠ পাঠ	নফল সালাত	১১৮
২য় পাঠ	নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান	৬৮	৬ষ্ঠ অধ্যায়	সাওম	১২১
৩য় পাঠ	কয়েকটি নাজাসাত (নাপাক) প্রাণী	৬৯	১ম পাঠ	আহকামুস সাওম	১২১
৩য় অধ্যায়	তাহারাত	৭২	২য় পাঠ	নফল সাওম	১২৯
১ম পাঠ	পবিত্রতা অর্জন ও পবিত্রকরণ	৭২	৭ম অধ্যায়	যাকাত	১৩৪
২য় পাঠ	তায়াম্মুম	৭৮	১ম পাঠ	যাকাতের পরিচয় ও ফযিলত	১৩৪
৩য় পাঠ	মেসওয়াক	৮২	২য় পাঠ	যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ	১৩৬
৪র্থ অধ্যায়	সালাতের জন্য ইকামত	৮৬	৩য় পাঠ	যার উপর যাকাত ফরয	১৩৭
১ম পাঠ	ইকামতের পরিচয়	৮৬	৪র্থ পাঠ	যাকাত আদায় না করার পরিণাম	১৩৮
২য় পাঠ	ইকামতের সুন্নত তরিকা	৮৭	৫ম পাঠ	যেসব সম্পদের যাকাত ফরয	১৩৯
৫ম অধ্যায়	আস সালাত	৯০	৮ম অধ্যায়	আল আতইমা ওয়াল আশরিবা	১৪২

তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক

১ম অধ্যায়	উত্তম চরিত্র	১৪৭	৩য় অধ্যায়	দোআ ও মুনাজাত	১৬৯
২য় অধ্যায়	অসচ্চরিত্র	১৬২			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ
আল আকাইদ
اَلْعَقَائِدُ

প্রথম অধ্যায়
আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ)

প্রথমপাঠ
সহিহ আকিদার গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ اَلَّذِى عَلَّمَنَا الدِّيْنَ بِوَسِيْلَةِ رُوْحِ الْأَمِيْنِ عَلٰى لِسَانِ حَبِيْبِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

আকাইদের পরিচয়

আকিদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দটি عقد মূল ধাতু থেকে এসেছে। শব্দটির অর্থ বন্ধন ও বিশ্বাস। আকিদা (عَقِيْدَةٌ) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আকাইদ (عَقَائِدُ)। যে দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে মানুষের চিন্তা, চেতনা পরিচালিত হয় এবং কর্মসমূহ সম্পাদনের পথ ও পদ্ধতি বৈধতা লাভ করে, তারই নাম আকিদা।

সহিহ আকিদার পরিচয়

শরিয়তের পরিভাষায় সহিহ আকিদার পরিচয় হলো –

مَا عَقَدَ عَلَيْهِ الْقَلْبُ وَالضَّمِيْرُ مِنَ التَّوْحِيدِ وَالرِّسَالَةِ وَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ : তাওহিদ, রিসালাত ও প্রিয়নবি (ﷺ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকিদা। (ইকদুল জেনান, পৃ. ৭)

আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো চিন্তা, দর্শন, কর্ম যথার্থ ও ফলপ্রসূ হয় না। আমলকে যদি দেহ ধরা হয়, আকিদা এর প্রাণ। দেহ যেভাবে প্রাণ ছাড়া অকার্যকর তেমনি সহিহ আকিদা ছাড়া আমলও অকার্যকর। তাই ইসলামি শরিয়তে আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করা ফরয করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ذَاتٌ (যাত) বা সত্তা, صِفَاتٌ (সিফাত) বা গুণাবলি, حُقُوْقٌ (হুকুক) বা আইনগত অধিকার, اِلٰـهٌ (ইলাহ) বা ইবাদত ও সম্মান পাওয়ার একমাত্র হকদার হওয়ার বিষয়ে সুস্পষ্ট চিন্তা-দর্শন না থাকলে সহিহ আকিদা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না।

(مَالِكٌ) বা অধিকর্তা, (رَبٌّ) বা পালনকর্তা, (اِلٰـهٌ) বা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ ও একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। তাঁর প্রেরিত ও মনোনীত নবি ও রসুলগণ তারই দীনের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করেছেন। আকিদার মূল বিষয় হলো আল্লাহ তাআলার গুনাবলিসহ তাঁর সত্তা, নূরের তৈরি ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাবসমূহ, সকল নবি ও রসুল, পরকালীন জীবন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত তকদিরের ভালো মন্দ এবং মৃত্যুর পর পূনরুত্থানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা এবং এসব সঠিকভাবে উপলব্ধি করা ইলমুল আকাইদ এর মূল বিষয়।

এক আল্লাহকে ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে মানার মাঝে যে সকল শান্তি নিহিত তা দলিল ও প্রমাণের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা, মনে স্থান দেওয়াই ইমানের মূল চেতনা। আকিদা সহিহ না হলে বান্দার কোনো আমলই গ্রহণযোগ্য হবে না।

দ্বিতীয় পাঠ

ভ্রান্ত আকিদার কুফল

সহিহ বা বিশুদ্ধ আকিদা নেক আমল কবুলের পূর্বশর্ত। উপরে উল্লিখিত সহিহ আকিদাসমূহ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি পরিপন্থি কোনো কিছুর উপর বিশ্বাস করা ভ্রান্ত আকিদা। আকিদা সহিহ না করে একজন লোক যদি সারা জীবন সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ করে, যাকাত দেয়; তা কবুল হবে না, তার সব আমলই নিষ্ফল হবে। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায় সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে, হজ করে, আযান দেয়, মসজিদ তৈরি করে কিন্তু তাঁরা প্রিয় নবি (ﷺ)-কে শেষ নবি মানে না। তারা মনে করে তাদের ধর্মের প্রবর্তক গোলাম আহমদ কাদিয়ানিই শেষ নবি। এই একটি ভ্রান্ত আকিদার ফলে তারা যে মুসলমানদের দলভুক্ত নন, এ বিষয়ে সমগ্র বিশ্বের আলেম সমাজ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন।

অনুরূপভাবে যারা প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ মনে করে, প্রিয়নবি (ﷺ) মরে মাটিতে মিশে গেছেন, তাঁর কোনো ক্ষমতাই নেই ইত্যাদি ভ্রান্ত আকিদা পোষণ করে তাদের কোনো আমলই কবুল হবে না। আবার কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বা সমগুণ সম্পন্ন ও সমশক্তিধর মনে করা সবচেয়ে বড় যুলম। এ ধরনের কাজ শিরক, আল্লাহর সাথে শিরক করা বড় গুনাহের কাজ।
আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই শিরক করা চরম যুলম। (সুরা লোকমান, ১৩)

এইভাবে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল মনে করা এবং রসুল (ﷺ)-এর সুন্নতকে অবজ্ঞা করার ফল জাহান্নাম। তাই বলা হয়– إِهَانَةُ الرَّسُوْلِ كُفْرٌ

অর্থ : রসুল (ﷺ)-কে অবজ্ঞা করা, তার শান ও মর্যাদাকে হেয় প্রতিপন্ন করা কুফুরি।

প্রিয়নবি (ﷺ)-এর শানে বেআদবি করলে সকল আমল বরবাদ হয়ে হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ.

অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা নবির কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করোনা এবং নিজেদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চস্বরে কথা বলো না, কারণ এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে। (সুরা হুজুরাত, ২)

এক কথায়, সহিহ আমল এবং আমলের ফলাফল পেতে হলে সহিহ আকিদা অবশ্যই চাই। শিরক, কুফর ও নেফাক মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। সহিহ আকিদা নিয়ে শরিয়ত ও তরিকতের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আকিদা বিষয়ে সহিহ ইলম অর্জন করার বিধান কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২.সবচেয়ে বড় যুলম কোনটি?

ক. শিরক খ. কুফর

গ. নিফাক ঘ. বিদআত

৩. ইলমুল আকাইদের কাজ হচ্ছে-

i. আল্লাহর যাত ও সেফাত জানা

ii. ইমানের শাখাসমূহ দৃঢ় বিশ্বাস করা

iii. নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

জসিম বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত। সে বলে নবুয়তের দরজা উন্মুক্ত, আরও নবি আসতে পারে।

৪. জসিমের কথা অনুযায়ী বিশ্বাস করলে সে কী হবে?

ক. মুনাফিক খ. কাফির

গ. ফাসিক ঘ. মুশরিক

তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধি হতে হবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। তার সূচনা হবে ব্যক্তির আত্মিক পরিশুদ্ধি থেকে। নবি-রসুলগণের প্রধান চারটি দায়িত্বের মধ্যে তাযকিয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তিলাওয়াতে আয়াত, তাযকিয়া, তালিমুল কিতাব ও তালিমুল হিকমা-এ চারটি বিষয়ের কোনো একটি বাদ দিলে রসুল (ﷺ)-কে মানা হয় না। এ জন্যই তাযকিয়া ও তাসাউফের ইলম অর্জন করা ফরযে আইন। সালাত, সাওম, যাকাত, হজ যেভাবে শিক্ষা করা ও আমল করা ফরযে আইন, একইভাবে ইলমুত্ তাযকিয়া ও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন করা এবং আমলে পরিণত করাও ফরযে আইন।

মানুষের শারীরিক রোগ চিকিৎসার জন্য যেভাবে ডাক্তার প্রয়োজন, তদ্রূপ আত্মিক রোগের জন্য শায়খ বা আধ্যাত্মিক ওস্তাদের প্রয়োজন, যিনি আল্লাহ, রসুল (ﷺ) ও সালেহ বান্দাগণের তরিকা মোতাবেক তাযকিয়ার জ্ঞান দান করবেন। আল্লাহ তাআলা তাযকিয়া অর্জনকারীদের সফলকাম বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

অর্থ : নিশ্চয়ই সফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তাঁর প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত কায়েম করে। (সুরা আলা, ১৪-১৫)

আল্লাহ তাআলা প্রথমত তাযকিয়া অর্জন, দ্বিতীয়ত পরিশুদ্ধ অন্তরে যিকির জারিকরণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে পবিত্র অন্তরে যিকির চলা অবস্থায় সালাত আদায় করার কথা বলেছেন। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধি, অন্তরে যিকির ও বাহ্যিক সালাত আদায়, এ তিনটি কাজই একজন মুমিনের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইমানের শাখা-প্রশাখা কয়টি?

ক. ৫০টি খ. ৬০ টি

গ. ৭০ টি ঘ. ৮০ টি

২. تَزْكِيَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. পরিশুদ্ধ করা খ. তাসাওফ অর্জন করা

গ. নৈকট্য লাভ করা ঘ. বিশ্বাস করা

৩. দীন ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা, যা দ্বারা মানুষ

i. ইহ-পরকালীন মুক্তি লাভ করে

ii. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে

iii. অনেক ধন-সম্পত্তি লাভ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

মাসুদ মনে করে মানুষের মৃত্যুর পর তার দেহ পঁচে যায়। তাই তা বিচারের জন্য উত্থিত হওয়া অসম্ভব।

৪. মাসুদের ধারণা কিসের পরিপন্থি?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহসান ঘ. ইবাদত

৫. এমতাবস্থায় মাসুদের করণীয় হচ্ছে-

i. আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

ii. ইমানের সকল বিষয় বিশ্বাস করা

iii. বেশি বেশি নেক আমল করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

আবদুর রহমান সাহেব একজন হক্কানি পীরের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়মিত যিকির আযকার করেন। তা দেখে শাহেদ আলি তাকে বললেন, চাচা এভাবে যিকির করার কি প্রয়োজন? সালাত আদায় ও সাওম পালনসহ সকল ইবাদতই যিকিরের অর্ন্তগত। আবদুর রহমান সাহেব তাকে বললেন, ইবাদত বন্দেগি করার জন্য আত্মার পরিশুদ্ধতা অপরিহার্য।

ক. اَلدِّيْنُ (আদ-দীন) অর্থ কী?

খ. হাদিসে জিবরাইল বলতে কী বোঝ? লেখ।

গ. আবদুর রহমান সাহেবের কার্যক্রম ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শাহেদ আলির বক্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়
আল্লাহর প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِاللّٰهِ

প্রথম পাঠ
পবিত্র কুরআনের আলোকে আল্লাহর প্রতি ইমান

ইমান (اَلْإِيْمَانُ) ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের প্রথম ও প্রধান বুনিয়াদ। এর অর্থ অন্তরের বিশ্বাস, শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা, স্বীকার করা, ভরসা করা ইত্যাদি। কুরআন মাজিদে বিভিন্ন আঙ্গিকে ৭৮৪ বার ইমান প্রসঙ্গ এসেছে। শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হলো–

تَصْدِيْقُ النَّبِـيِّ ﷺ ذَاتًا وَ صِفَةً وَبِمَا جَاءَ بِهِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ)-এর সত্তা, গুণাবলি এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন এ সবকিছুকে সত্য বলে বিশ্বাস করা।

আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ.

অর্থ : রসুল, তাঁর প্রতি প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছেন এবং মুমিনগনও। তাদের সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসুলগণের প্রতি ইমান এনেছেন। (সুরা বাকারা, ২৮৫)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

অর্থ : যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাঁদের প্রভুর নিকট তাঁদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। (সুরা বাকারা, ৬২)।

ইমানের বিপরীতে কুফরির পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْـخَاسِرِينَ.

অর্থ : যে ইমানকে অস্বীকার করবে, তার যাবতীয় আমল নিষ্ফল ও পরিশেষে সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সুরা মায়েদা, ৫)

চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, আল্লাহ (رَزَّاقٌ) জীবিকাদানকারী। তিনি (مَالِكٌ) মালিক। মালিকানা একমাত্র তাঁর, এভাবে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্য কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার মনে না করা। এ স্তরের তাওহিদকে তাওহিদ ফিল আসমা ওয়াস সিফাত (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)ও বলা হয়।

(গ) তাওহিদ ফিলহুকুক (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْـحُقُوْقِ)

আল্লাহ তাআলা সকল অধিকারের একক মালিক, এ কথা মেনে নেয়াই তাওহিদ ফিল হুকুক। আল্লাহ তাআলা সর্বময় ক্ষমতার মালিক,সবকিছুর পালনকর্তা, সকল কিছুর সার্বভৌম অধিকার তাঁরই একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা। আল্লাহকে (رَبٌّ) রব বলে স্বীকার করা। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে তাঁর সমকক্ষ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে স্বীকার না করা। সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তাআলা এ বিশ্বাস মনে-প্রাণে ধারণ করা। এ প্রকার তাওহিদকে তাওহিদ ফির রুবুবিয়্যাহ (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الرَّ بُوْبِيَّةِ)ও বলা হয়।

(ঘ) তাওহিদ ফিল ইবাদত : (اَلتَّوْحِيْدُ فِى الْعِبَادَاتِ)

একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে এককভাবে ইবাদাতের হকদার মনে করা। আল্লাহ তাআলাকেই ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য মনে করা। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ না করা, কুরবানি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই করা। এক কথায়, আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত না করে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করাকে তাওহিদ ফিল ইবাদত বলে।

দ্বিতীয় পাঠ

আল আসমাউল হুসনা

اَلْأَسْمَاءُ الْـحُسْنٰى

আল আসমাউল হুসনার পরিচয়

আল আসমাউল হুসনা (اَلْأَسْمَاءُ الْـحُسْنٰى)এর অর্থ হলো সুন্দর নামসমূহ। আল্লাহ (اَللّٰهُ) হচ্ছে اِسْمُ ذَاتٍ বা সত্তাগত নাম। এ মহান সত্তার প্রকৃত পরিচয় লাভ করতে হলে, তাকে চিনতে হলে, তাঁর সম্পর্কে জানতে হলে, তাঁর গুণাবলি এবং ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ তাআলার

সত্তা যেমন সুমহান, অসীম ও অবিনশ্বর, তাঁর صِفَاتٌ বা গুণাবলি এবং ক্ষমতাও অসীম, অবিনশ্বর। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ৯৯টি গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এ সকল নাম দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি প্রকাশ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাকে যে সকল গুণবাচক নাম দিয়ে ডাকা হয় সেগুলোকে اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (আল আসমাউল হুসনা) বলে।

আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব

মানুষের জীবনে আল আসমাউল হুসনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। এ সকল গুণবাচক নাম দ্বারা আমরা আল্লাহকে চিনতে পারি। মূলকথা হচ্ছে, সত্তাগত দিক থেকে আল্লাহ তাআলা যেমন এক অদ্বিতীয়, তেমনিভাবে গুণাবলি ও সিফাতের ক্ষেত্রেও তিনি একক ও অদ্বিতীয়। এ সমস্ত গুণে তাঁর কোনো শরিক এবং সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর গুণ নিরঙ্কুশ ও অসীম।

এসব গুণবাচক নাম দিয়ে আল্লাহকে ডাকার নির্দেশ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَ لِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا.

অর্থ : আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সে সকল নামেই ডাকবে।
(সুরা আরাফ, ১৮০)

আসমাউল হুসনা দ্বারা আল্লাহকে ডাকলে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন এবং তিনি জান্নাত দান করবেন। এ সম্পর্কে হাদিসে নববীতে উল্লেখ আছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى تِسْعَةً وَّتِسْعُوْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (﵁) থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন– আল্লাহ্ তাআলার ৯৯টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি সেগুলো আয়ত্ত করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারি)।

হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (﵁) হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

কারো কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা ইত্যাদি উপস্থিত হলে, সে আসমাউল হুসনা পাঠ করে দোআ করবে, আল্লাহ তাআলা তার বিপদ দূর করে শান্তি দান করবেন। (মুসনাদে আহমদ)

আল আসমাউল হুসনা

আল্লাহ পাকের গুণবাচক নামগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। তা হলো–

(ক) আত্মপরিচয়মূলক।

(খ) সৃষ্টি বিষয়ক।

(গ) প্রেম ও করুণা বিষয়ক।

(ঘ) গৌরব ও মহত্ত্ব বিষয়ক।

(ঙ) জ্ঞান সম্পর্কীয়।

(চ) শক্তি ও ক্ষমতা বিষয়ক।

(ছ) শাসন বিষয়ক।

(ক) আত্মপরিচয়মূলক

(১) আল আহাদু اَلْاَحَدُ (এক)

(২) আস সামাদু اَلصَّمَدُ (অমুখাপেক্ষী, অভাবমুক্ত)

(৩) আল আউয়ালু اَلْاَوَّلُ (আদি)

(৪) আল আখেরু اَلْاٰخِرُ (অন্ত)

(৫) আল লাতিফু اَللَّطِيْفُ (অনুগ্রহশীল)

(৬) আল হাইয়্যু اَلْحَيُّ (চিরঞ্জীব)

(৭) আল কাইয়্যুমু اَلْقَيُّوْمُ (চিরস্থায়ী) ইত্যাদি।

২. সৃষ্টি বিষয়ক

(৮) আল খালেকু اَلْخَالِقُ (স্রষ্টা)

(৯) আল মুবদিউ اَلْمُبْدِئُ (অনুকরণ ছাড়াই স্রষ্টা)

(১০) আল মুইদু اَلْمُعِيْدُ (পুনর্জীবন দানকারী)

(১১) আল বাদীউ اَلْبَدِيْعُ (নমুনা ছাড়াই সর্বসময় সৃজনকারী) ইত্যাদি।

৩. প্রেম ও করুণা বিষয়ক

(১২) আর রহমানু اَلرَّحْمٰنُ (পরম করুণাময়)

(১৩) আর রহীমু اَلرَّحِيْمُ (অসীম দয়ালু)

(১৪) আল গাফুরু اَلْغَفُوْرُ (পরম ক্ষমাশীল)

(১৫) আর রউফু اَلرَّءُوْفُ (স্নেহশীল)

(১৬) আল ওয়াদূদু اَلْوَدُوْدُ (প্রেমময়) ইত্যাদি।

৪. গৌরব ও মহত্ত্ব বিষয়ক

(১৭) আল আযিমু اَلْعَظِيْمُ (সুমহান)

(১৮) আল আযিযু اَلْعَزِيْزُ (মহাক্ষমতাবান)

(১৯) আল মাজিদু اَلْمَجِيْدُ (মহাসম্মানী)

(২০) যুল-জালালি ওয়াল ইকরাম ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ (গৌরব ও সম্মানের অধিকারী)

(২১) আল আলিয়্যু اَلْعَلِـيُّ (সুমহান)

(২২) আল মুতাকাব্বিরু اَلْمُتَكَبِّرُ (অতীব মহিমান্বিত) ইত্যাদি।

৫. জ্ঞান সম্পর্কীয়

(২৩) আল বাসিরু اَلْبَصِيْرُ (সর্বদ্রষ্টা)

(২৪) আস সামিউ اَلسَّمِيْعُ (সর্বশ্রোতা)

(২৫) আল খাবিরু اَلْـخَبِيْرُ (সম্যক অবহিত)

(২৬) আশ শাহিদু اَلشَّهِيْدُ (প্রত্যক্ষ কারী)

(২৭) আল হাকিমু اَلْـحَكِيْمُ (মহাপ্রজ্ঞাবান) ইত্যাদি।

৬. শক্তি ও ক্ষমতা বিষয়ক

(২৮) আল কাদিরু اَلْقَدِيْرُ (সর্ব শক্তিমান)

(২৯) আল মুকতাদিরু اَلْمُقْتَدِرُ (প্রবল)

(৩০) আল জাব্বারু اَلْـجَبَّارُ (মহাপরাক্রমশালী) ইত্যাদি।

গ. মাওলানা আবদুর রহমান সাহেবের প্রথম বক্তব্যটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদের প্রশ্নোত্তরে মাওলানা আবদুর রহমান সাহেব যা বললেন, তা ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। আবদুস সালাম সাহেব নিয়মিত আল আসমাউল হুসনার অযিফা আদায় করেন। তা দেখে আবদুল মজিদ সাহেব বললেন, আল্লাহ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম। তাই আপনার এ নামেই যিকির করা উচিত। আবদুস সালাম সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল আসমাউল হুসনা প্রত্যেক মুসলমানের জানা আবশ্যক।

ক. رَؤُوْفٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. اَلْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى বলতে কী বোঝ?

গ. আবদুস সালাম সাহেবের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ 'আল আসামাউল হুসনার যিকির হলো জান্নাত লাভের সহায়ক' উক্তিটির আলোকে আবদুল মজিদ সাহেবের বক্তব্যকে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

নবি-রসুলগণের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالـرُّسُلِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত নবি ও রসুল

নবি ও রসুলের পরিচয় :

নবি ও রসুলগণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত বা বার্তাবাহক। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রত্যেক জাতি ও সম্প্রদায়ের নিকট নবি ও রসুলদেরকে প্রেরণ করেছেন। যিনি নতুন শরীয়তসহ প্রেরিত হয়েছেন তাকে রসুল বলে। আর যিনি পূর্ববর্তী রসুলের শরীয়ত অনুযায়ী দ্বীন প্রচার করেছেন তাকে নবি বলা হয়।

আল কুরআনে ২৫ জন নবি-রসুলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন মজিদে বর্ণিত হয়নি এমন অনেক নবি ও রসুল রয়েছেন। আমরা তাঁদের অনেকের নাম জানি আবার অনেকের নাম জানি না। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মহানবি (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন–

وَ رُسُلاً قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

অর্থ: অনেক রসুল প্রেরণ করেছি যাদের কথা আমি পূর্বে আপনাকে বলেছি এবং অনেক রসুল যাদের কথা আপনাকে বলিনি (সুরা নিসা, ১৬৪)।

কুরআন মাজিদে ২৫ জন নবি-রসুল (عليهم السلام)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন–

১. হজরত আদম (عليه السلام)
২. হজরত ইদরিস (عليه السلام)
৩. হজরত নুহ (عليه السلام)
৪. হজরত ইবরাহিম (عليه السلام)
৫. হজরত লুত (عليه السلام)
৬. হজরত ইসমাঈল (عليه السلام)

৭. হজরত ইসহাক (আ:)

৮. হজরত ইয়াকুব (আ:)

৯. হজরত ইউসুফ (আ:)

১০. হজরত শোয়াইব (আ:)

১১. হজরত মুসা (আ:)

১২. হজরত হারুন (আ:)

১৩. হজরত আইয়ুব (আ:)

১৪. হজরত দাউদ (আ:)

১৫. হজরত সুলায়মান (আ:)

১৬. হজরত ইউনুস (আ:)

১৭. হজরত ইলিয়াস (আ:)

১৮. হজরত যাকারিয়া (আ:)

১৯. হজরত ইয়াহ্ইয়া (আ:)

২০. হজরত হুদ (আ:)

২১. হজরত সালেহ (আ:)

২২. হজরত যুলকিফল (আ:)

২৩. হজরত আল ইয়াসা (আ:)

২৪. হজরত ইসা (আ:)

২৫. হজরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা:)

উল্লেখ্য যে, হযরত ওজায়ের (আ:) এর নবি হওয়ার বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সকল নবি ও রসুলের দীন ছিলো ইসলাম। তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেওয়াই ছিলো তাঁদের মূল কাজ।

দ্বিতীয় পাঠ

নবি ও রসুলগণের সাথে সাধারণ মানুষের পার্থক্য

নবি ও রসুল (ﷺ) গণের ব্যাপারে আমাদের এ আকিদা থাকতে হবে যে, তাঁরা সর্বযুগেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। শারীরিক গঠনে, বংশ পরিচয়ে, আচার-আচরণে, জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাঁরা ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সাথে অন্য কোনো মানুষের তুলনা করা বা অন্যের মতো মনে করা চরম বেআদবি। নবি ও রসুল (ﷺ)গণ ছিলেন মাসুম مَعْصُوْمٌ বা নিষ্পাপ। তাঁদের সামান্যতম গুনাহ ছিলো এ ধারণা বা আকিদা পোষণ করা ইমান পরিপন্থী। তারা ছিলেন সমাজের, দেশের ও জাতির ইমাম বা প্রধান।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

অর্থ : এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথ প্রদর্শন করতো; তাদেরকে অহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করতো। (সুরা আম্বিয়া, ৭৩)।

নবি ও রসুল (ﷺ)গণ মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শবান ব্যক্তি। তাঁরা নবুওয়াত লাভের পূর্বে বা পরে সর্বাবস্থায় কুফরি ও শিরকসহ ছোট-বড় সর্বপ্রকার গুণাহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন। এ পবিত্রতা তাঁদের পৃথিবীতে আগমন থেকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, নবুওয়াত ও রিসালাতের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে ছিলো। তাঁরা নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পূর্বেও ছিলেন মা'সুম বা নিষ্পাপ এবং নবুওয়াত ও রিসালাত লাভের পরেও নিষ্পাপ এ আকিদা মন মানসিকতায় পোষণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁদের ক্ষমা চাওয়া বা মাফ চাওয়া সবই ছিলো উম্মতের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং নিজেদের বিনয় প্রকাশের জন্যে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

প্রথম পাঠ

আল কুরআনে বর্ণিত ফেরেশতাদের কার্যক্রম

(ক) আল্লাহর হুকুম মানা ও তাসবিহ পাঠ

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি। তারা মানবীয় দূর্বলতা, ক্লান্তি, কামনা বাসনা বা পাপেচ্ছা ও পানাহার থেকে মুক্ত। তাঁরা সর্বদা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর গুণগান করেন এবং তাঁর নির্দেশ পালন করেন। ফেরেশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন–

بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ، لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

অর্থ : তাঁরা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তাঁরা আগে বেড়ে কথা বলে না; তাঁরা তো তাঁর আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে। (সুরা আম্বিয়া, ২৬-২৭)

অন্যত্র আল্লাহ পাক তাঁদের বিষয়ে বলেন–

لا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থ : আল্লাহ তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেন তা তাঁরা লঙ্ঘন করে না এবং তাঁদেরকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, তা তাঁরা পালন করে। (সুরা তাহরিম, ৬)

(খ) আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া

ফেরেশতাদের সার্বক্ষণিক একটি দায়িত্ব হলো আল্লাহর প্রিয় হাবিবের উপর দরুদ পড়া। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ নবির প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবির জন্য রহমতের দোআ করেন। (সুরা আহযাব, ৫৬)

(গ) কর্ম নির্বাহ ও কর্ম বণ্টন করা

সাধারণভাবে আল্লাহর ইবাদত, তাসবিহ ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করা ছাড়াও ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। মহান আল্লাহ বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য তাঁদেরকে দায়িত্ব দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ، وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ، فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا ، يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ.

অর্থ: শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে। এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়। এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে। আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়। অতঃপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে। সেদিন প্রথম সিঙ্গাধ্বনি প্রকম্পিত করবে। (সুরা নাযিয়াত, ১-৬)

(ঘ) ওহি পৌঁছানো

ফেরেশতাদের একটি মৌলিক দায়িত্ব হলো, নবি ও রসুলগণের নিকট আল্লাহর ওহি পৌঁছান। জিবরাইল (ﷺ) বিশেষভাবে এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট জিবরাইল (ﷺ) ওহি নিয়ে আসতেন।

(ঙ) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ

ফেরেশতাগণের অন্য একটি দায়িত্ব আল্লাহর হুকুমে তাঁরই মর্জিমত মানুষের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন–

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ

অর্থ: মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে, তাঁরা আল্লাহ তাআলা আদেশ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সুরা রাদ, ১১)

(চ) মুমিন বান্দাগণের জন্য দোআ করা

ফেরেশতাগণের একটি বিশেষ কর্ম হলো ইমানদারদের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে সুপারিশ ও দোআ করা। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

অর্থ : আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদের ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (সুরা মুমিন, ৭)

দ্বিতীয় পাঠ

কিরামান কাতেবিনের কাজ

কিরামান কাতেবিন বা সম্মানিত লেখক ফেরেশতাগণ মানুষ ভালো-মন্দ যা ই করুক না কেন সব কিছুর হুবহু রেকর্ড করেন। যে শব্দটি মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তা সাথে সাথে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন–

اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থ : যখন গ্রহণকারী দুই ফেরেশতা মানুষের ডানে ও বামে বসে তার কার্যাবলি গ্রহণ করে সে যে কথাই উচ্চারণ করে, কিন্তু একজন অপেক্ষমান সদাপ্রস্তুত প্রহরী তার কাছে বিদ্যমান থাকে।

(সুরা ক্বাফ, ১৭-১৮)

ডানে ও বামে যে ফেরেশতা রিপোর্ট সংগ্রহ করেন তারা অতীব সম্মানিত। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের উপর নিযুক্ত রয়েছে সংরক্ষক ফেরেশতাগণ, সম্মানিত লেখকবৃন্দ তারা জানেন তোমরা যা কর। (সুরা ইনফিতার, ১০-১২)।

তৃতীয় পাঠ
মুনকার ও নাকিরের পরিচয় ও দায়িত্ব

মুনকার ও নাকিরের পরিচয়

মুনকার (مُنْكَرٌ) ও নাকির (نَكِيْرٌ) দুজন ফেরেশতার নাম। যার অর্থ অপরিচিত ও বিকট চেহারাসম্পন্ন। মুনকার ও নাকির কবরে এসে মৃতব্যক্তিকে প্রশ্নকারী এমন দুজন ফেরেশতা যাদের অদ্ভুত চেহারা ও ভীতিপ্রদ গঠন অবয়বের কারণে এই রূপ নাম দেওয়া হয়েছে অথবা এ কারণে যে তারা উভয়ই মৃতব্যক্তির নিকট অপরিচিত।

মুনকার ও নাকির সম্পর্কে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِذَا اُقْبِرَ الْمَيِّتُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَادَانِ اَرْزَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَالْاٰخَرُ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلُ مَنْ رَّبُّكَ وَمَادِيْنُكَ وَمَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ .

অর্থ : মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কালো বর্ণের দেহবিশিষ্ট এবং নীল বর্ণের চক্ষুবিশিষ্ট দুজন ফেরেশতা কবরে আগমন করে। এর একজনকে বলা হয় 'মুনকার' অপর জনকে বলা হয় 'নাকির'। তারা দু'জন রসুলুল্লাহ (ﷺ) কে তার সামনে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করবে–

مَنْ رَبُّكَ؟ - তোমার রব কে?

مَا دِيْنُكَ؟ - তোমার দীন কী?

وَ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِى هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمْ - এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কী বলেছিলে, যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল? (জামে তিরমিযি ও মেশকাত)।

মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয়, তবে সে জবাব দেবে,

رَبِّىَ اللهُ - আমার রব আল্লাহ।

دِيْنِى الإِسْلاَمُ - আমার দীন ইসলাম।

আর ইনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব এবং তাঁর রসুল (ﷺ)।

তাদের চোখ বিজলির ন্যায় উজ্জ্বল, আওয়াজ বজ্রতুল্য এবং তাদের হাতে একটি লোহার ভারী হাতুড়ি থাকবে, যাকে হজের মৌসুম সমাগত সকল হাজিরা একত্রে মিলেও উত্তোলন করতে পারবে না। মুনকার ও নাকিরের উপর বিশ্বাস রাখা মৌলিক আকিদার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- 'কবরে মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন ও দেহের মধ্যে রূহ এর পুনরায় ফিরে আসার কথা সঠিক, বহুসংখ্যক হাদিসের ভিত্তিতে আমরা এই বিশ্বাস করি যে, মুনকার ও নাকিরের প্রশ্ন করার বিষয়টি সত্য।' (কিতাবুল ওসিয়ত, পৃ. ২৩)।

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

وَ مَا مِنْ غَائِبَةٍ فِى السَّمٰوَاتِ وَ لَا فِى الْاَرْضِ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٌ.

অর্থ : আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কোনো অদৃশ্য বিষয় নেই যা কুরআন মাজিদে নেই।

(সুরা নামল, ৭৫)

কুরআন মাজিদে মানব জাতির জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে এবং খাতামুন নাবিয়্যিন রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। বিদায় হজের সময় আরাফাতের ময়দানে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন–

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا.

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণতা দান করলাম, আমার নেয়ামত তোমাদের জন্য পূর্ণতায় পৌঁছালাম, আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।

(সুরা মায়িদাহ, ৩)

স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এই কিতাবের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাই এতে কোনো তাহরিফ তথা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের অবকাশ নেই।

ভাষার অলংকার ও মাধুর্য এবং বর্ণনার স্বকীয়তা কুরআন মাজিদকে সকল গ্রন্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়ার অন্যতম কারণ। কুরআন فُرْقَانٌ বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী গ্রন্থ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তৃতীয় পাঠ

কুরআনের বিধান অস্বীকার করার পরিণাম

আল কুরআন আল্লাহর কালাম, চিরন্তন বাণী। লাওহে মাহফুযে নুরের ফলকে সংরক্ষিত। দীর্ঘ তেইশ বছরে, নুরের ফেরেশতা হজরত জিবরাইল (ﷺ)-এর মাধ্যমে, নুরানী কুরআন, নুরে মুজাস্‌সাম রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কিতাব সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত। বাতিল ইমান-আকিদাকে দূরীভুত করে, তাওহিদী আকিদাকে সু-প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই নাযিল হয়েছে এই কুরআন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

অর্থ : অবশ্যই এটা এক মহিমময় কিতাব, কোনো মিথ্যা এর সামনে থেকে বা পিছন থেকে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, এ এক প্রজ্ঞাময় ও প্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ।

(সুরা ফুসসিলাত, ৪১)।

এই কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণকে মনে প্রাণে মেনে নেওয়াই হলো ইমানের দাবি। কিছু অংশ মেনে নিয়ে কিছু অংশ অস্বীকার করলে এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

অর্থ : তোমরা কিতাবের কিছু অংশের উপর ইমান আনয়ন করে কিছু অংশ অস্বীকার করছো? তোমাদের মধ্যে যারা এ কাজটা করে তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অপমান, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোর শাস্তির মাঝে নিপতিত করা হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে অনবহিত নন। (সুরা বাকারা, ৮৫)

কুরআনকে অস্বীকার করা কুফরি। জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনকে মুক্তির দিশারি হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়াই ইমান।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সকল আসমানি কিতাবের প্রতি ইমান আনার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২। কোন কিতাবকে فرقان বা হক বাতিলের পার্থক্যকারী বলা হয়?

ক. তাওরাত খ. যাবুর

গ. ইঞ্জিল ঘ. কুরআন

কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

i. অধিক তেলাওয়াত

ii. সঠিক পথ প্রদর্শন

iii. ইহ-পরকালীন মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

মামুন বলে, আল কুরআনে মানুষের উপকারের জন্য নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনের যে অংশ দিয়ে আমার উপকার হয়, আমি সে অংশ অনুসরণ করব।

৪। মামুনের বক্তব্যটি কোন পর্যায়ের?

ক. কুফুরি খ. নিফাকি

গ. ফুসুকি ঘ. বিদআতি

৫। মামুনের উচিত হচ্ছে-

i. সম্পূর্ণ কুরআন মাজিদ মান্য করা

ii. কুরআন মাজিদের উপর পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস রাখা

iii. কুরআন মাজিদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

'ক' গ্রামের পাটওয়ারী ও হাওলাদার বংশের মধ্যে বংশমর্যাদা নিয়ে গণ্ডগোল এবং পরে মারামারি হয়। দ্বারিয়াপুর গ্রামের মেম্বার জনাব আব্দুল হক 'ক' গ্রামের পাটওয়ারী বংশের মাওলানা আব্দুল ওহাবকে বলেন, 'তোমাদের গ্রামের বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নেওয়া যায় না?' পরবর্তীতে জনাব আব্দুল ওহাব অনেক চেষ্টায় দুই বংশের লোকজনকে একত্রিত করে কুরআনুল কারিমের আয়াত শুনান–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ.

কিন্তু হাওলাদার বংশের আব্দুর রশিদ এক পর্যায়ে বললেন, তোমরা আমাদের বংশের উপর হাত তুলেছ, অপমান করেছ। আমরা তোমাদের সাথে নেই, এই বলে সকলকে নিয়ে চলে যান।

ক. কুরআন মাজিদ কাদের জন্য পথ প্রদর্শক?

খ. 'কুরআন সকল আসমানী কিতাবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব আব্দুল ওহাবের উদ্ধৃত আয়াত পরিস্থিতি অনুযায়ী কিরূপ? এর প্রয়োগ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাওলাদার বংশের আব্দুর রশিদ এবং সকলের আচরণ তোমার ফিকহ পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৫.জামীর কাজটি শরিয়তের বিধানে কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬. রাফীর কাজটি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে-

i. কুফুরি

ii. শিরকি

iii. মুনাফেকি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জাবের সাহেব মসজিদে ইমাম সাহেবকে আখেরাতের বিষয়ে আলোচনা করতে শুনলেন। আমলনামা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা শুনে খুব কাঁদলেন। সাদ্দাম তাকে বলল, কান্না থামাও তো; আলেমগণ এরূপই বলে থাকে। আসলে দুনিয়ার জীবনই শেষ।

ক. আমলনামা কী?

খ. 'আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী' বুঝিয়ে লেখ।

গ. সাদ্দামের মন্তব্য শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাবেরের অবস্থা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। ইরফান ও তাযকিয়া ভাই বোন। ইরফান মাদরাসায় পড়ে। সে ওস্তাদের কাছে আখেরাতে হাশরের ময়দানে পানির জন্য মানুষের ভীষণ কষ্টের কথা জানতে পেরে কাঁদছে। সে আরও শুনেছে আল্লাহর রসুল (ﷺ) একমাত্র মুমিন উম্মতকেই হাউযে কাউসারের পানি পান করাবেন। তাযকিয়া এ কথা শুনে বলল, আমার বান্ধবী আসমা বলছে দুনিয়াতে যেমন কাফির, মুশরিক পানি পায়, তেমনি আখেরাতেও পাবে; তাতে ভয়ের কিছুই নেই।

ক. হাউযে কাউসার কী?

খ. 'হাউযে কাউসারে বিশ্বাস ইমানের অঙ্গ' কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

গ. আসমার কথাটি শরিয়তে কেমন? উল্লেখ কর।

ঘ. ইরফানের কাজটি কুরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

নবম অধ্যায়
তাকদিরের প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ

প্রথম পাঠ
তাকদিরের পরিচয় ও এর প্রতি বিশ্বাস

তাকদিরের পরিচয়

তাকদির (تَقْدِيْرٌ) আরবি শব্দ। এটি قَدْرٌ থেকে উৎকলিত। এর অর্থ হলো নির্ধারণ করা, পরিমাপ করা, যথাযথ হওয়ার ব্যবস্থা করা।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভালো-মন্দ, জীবন-মরণ, খাদ্য-পানীয়, মান-সম্মান সবই আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। শরিয়তের পরিভাষায় এরূপ ভাগ্যলিপি বা বিধিলিপিকে তাকদির বলা হয়। আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন–

اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ.

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি সকল বস্তু নির্ধারিতরূপে বা পরিমাণমতো সৃষ্টি করেছি। (সুরা কামার, ৪৯)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَه تَقْدِيْرًا.

অর্থ : তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সে সবকে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

(সুরা ফুরকান, ২)

সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথা ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত রয়েছে।

তাকদির বিশ্বাসের সুফল

তাকদিরের ওপর বিশ্বাস মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ। এ বিশ্বাস মুমিনকে তার মানবীয় বহু দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে। যেমন, মানুষ সফলতা অর্জন করলে আনন্দিত হয়, আবার ব্যর্থ হলে বিমর্ষ হয়। তাকদিরে বিশ্বাস মানুষকে উভয় প্রকার দুর্বলতা থেকে হেফাজত করে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন–

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.

অর্থ : পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে থাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষে এটি খুবই সহজ কাজ। তা এজন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তার কারণে হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা হাদিদ, ২২-২৩)

তাকদিরে বিশ্বাসী মানুষ কঠিন থেকে কঠিনতর কোনো বিপদে পড়ে গিয়েও কখনো মনোবল হারায় না। তাকদিরে বিশ্বাস বান্দাকে সকল বিপদে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

দ্বিতীয় পাঠ

তাকদিরের উপর বিশ্বাস না করার পরিণাম

তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। তাকদিরে অবিশ্বাস এমন গুরুতর অপরাধ যে, মুহাম্মদ (ﷺ) নিজেও তাদেরকে লানত করেছেন। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, কেউ যদি আমার নির্ধারিত তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট না থাকে এবং বিপদে ধৈর্যধারণ না করে সে যেন আমি ছাড়া অন্য কাউকে রব বানিয়ে নেয়।

(মুসান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, মুসনাদু ইবনি আবি শায়বা)

হজরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) বলেন–

اَلْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ نِظَامُ التَّوْحِيْدِ فَمَنْ اٰمَنَ وَ كَذَبَ بِالْقَدْرِ فَقَدْ نَقَضَ لِلتَّوْحِيْدِ

অর্থ : আল্লাহর একত্ববাদ বিশ্বাসী হওয়া তাকদিরে বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কাজেই যে ব্যক্তি ইমান আনয়ন করল, কিন্তু তাকদিরকে অস্বীকার করলো প্রকৃতপক্ষে সে তাওহিদকেই প্রত্যাখ্যান করলো। (তরজুমানুস সুন্নাহ-৩/২৯)

তাই, প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাকদিরে বিশ্বাস করা।

তাকদির ও তাদবির

তাকদিরে বিশ্বাস করা যেমন ইমানের অংশ তেমনি কাজ করে যাওয়াও আল্লাহ ও রসুল (ﷺ)-এর নির্দেশ। তাকদিরে বিশ্বাসের অর্থ সব কাজ পরিত্যাগ করে, হাত-পা গুটিয়ে ভাগ্যবাদি হয়ে বসে থাকা নয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি দান করেছেন তা ব্যবহার করে কর্তব্য কর্ম করে যেতে হবে। কাজ করা বান্দার কর্তব্য, চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতে। তাই ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ে সাধ্যানুযায়ী কাজ করে যাওয়াই ইসলামের নির্দেশ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাকদিরের উপর ইমান আনার হুকুম কী?

ক.ফরজ খ.ওয়াজিব
গ.সুন্নত ঘ.মুস্তাহাব

২. কার পরিকল্পনা মোতাবেক সৃষ্টিজগত পরিচালিত হয়?

ক. ফেরেশতাদের খ. আল্লাহ তাআলার
গ. সরকার প্রধানদের ঘ. জনগণের

৩. আল্লাহ তাআলার ফয়সালা মোতাবেক হয়ে থাকে, মানুষের -

i. জীবনের স্থায়িত্ব
ii. ভালো-মন্দ
iii. জীবিকা নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

মামুন বার্ষিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে হতাশ হয়ে যায় এবং বলে, আমার আর পড়ালেখা করে লাভ নেই।

(১) ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.) বলেন- আমরা সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা ব্যতীত কখনো দোষ চর্চা করবো না।

(২) ইমাম মালিক (রহ.) বলেন- সাহাবিগণকে যারা হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় তাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা.)-কে হেয় প্রতিপন্ন করা।

(৩) ইমাম তাহাভী (রহ.) বলেন- যারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে অথবা তাদের কুৎসা রটায় আমরাও তাদেরকে শত্রু বলে মনে করি। আমরা কেবল সাহাবায়ে কেরামের গুণ চর্চা করি দোষ চর্চা করি না।

সারকথা হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের প্রতি কটূক্তি হতে বিরত থাকা ওয়াজিব। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ইফা)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সাহাবি শব্দের অর্থ হলো–

ক. দেশি খ. সঙ্গী

গ. সেবক ঘ. উপকারী

২। সাহাবিদের সম্মান করা–

ক. মুস্তাহাব খ. মুবাহ

গ. ওয়াজিব ঘ. মুস্তাহসান

৩। সাহাবিগণকে গালমন্দ করা–

i. মাকরুহ

ii. হারাম

iii. আল্লাহর লানতের কবলে পড়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

আঃ করিম ইতিহাস পড়তে গিয়ে সাহাবিদের মর্যাদার কথা জানতে পেরে আঃ রহিমকে বলল, বন্ধু সাহাবিদের নাম শুনে তা'যিম করতে হবে। তাঁদের সমালোচনা করা যাবে না। আঃ রহিম বলল, না এতে অসুবিধা নেই।

৪। আঃ করিমের কাজটির ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫। আঃ রহিমের কর্তব্য হলো -

i. তওবা করা

ii. ইস্তেগফার করা

iii. সাহাবিদের তা'যিম করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইকরাম ও ইসহাক মাদরাসায় পড়ে। আকাইদ ও ফিক্‌হ ক্লাসে শিক্ষক সাহাবিদের প্রশংসা, তা'যিম করলেন। ছাত্রদের তা'যিম করতে নসিহত করলেন। ইকরাম সাহাবিদের সমালোচনা করে তা'যিম করে না। বরং বলে তা'যিমের প্রয়োজনীয়তা কী?

ক. সাহাবিদের তা'যিম করার হুকুম কী?

খ. সাহাবিদের তা'যিম কেন করতে হবে? বুঝিয়ে লেখ

গ. ইকরামের কাজটি শরিয়তের কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. ওস্তাদের কাজটি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় ভাগ

আল ফিকহ

اَلْفِقْهُ

প্রথম অধ্যায়
ইলমে ফিকহের ইতিহাস
تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهِ

প্রথম পাঠ
ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ফিকহ (اَلْفِقْـهُ) শব্দের অর্থ জানা, বোঝা, উপলব্ধি করা, বিচক্ষণতা, অনুধাবন করা, সুক্ষ্মদর্শিতা অর্জন করা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ফিকহ হলো–

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالَـهَا وَمَاعَلَيْهَا

অর্থ : কল্যাণকর ও ক্ষতিকর ব্যাপারে আত্ম উপলব্ধিকে ফিকহ বলে। (কাওয়াইদুল ফিকহ, পৃ. ৪১৪)

কুরআন মাজিদে ফিকহ ফিদদীন অর্জন করার তাগিদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين.

অর্থ : ইমানদারদের প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একটি ক্ষুদ্রদল কেন দীনের সুক্ষ্ম জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে না। (সুরা তওবা, ১২২)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

অর্থ : আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, তাঁকে দীনের ফিকহ বা সুক্ষ জ্ঞান দান করেন। (সহিহ বুখারি)

প্রিয়নবি (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ، وَعِمَادُ هٰذَا الدِّينِ الْفِقْهُ.

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুরই খুঁটি রয়েছে, আর দীনের খুঁটি হল ফিকহ। (মুজামুল আওসাত ও তাবরানী)

কুরআন ও হাদিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তাসম সুক্ষ্মজ্ঞানসমূহকে বিন্যস্ত করে আমলের উপযোগী করার জন্য ইলমে ফিকহের বিকল্প নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায়ে কোনটি গ্রহণীয় আর কোনটি বর্জণীয় তা কুরআন সুন্নাহ থেকে আহরণ করে যাবতীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে যিনি যুগজিজ্ঞাসার আলোকে সমাধান পেশ করতে সক্ষম, তাকে ফকিহে মুজতাহিদ (فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ) বলা হয়।

প্রিয়নবি (ﷺ)-এর যুগে শরয়ি জিজ্ঞাসার জবাব তিনি নিজেই দিতেন। তারপর সাহাবায়ে কেরামের যুগে ফিকহি মাসয়ালার সমাধানের জন্য ফকিহ সাহাবাগণের বোর্ড ছিল, যারা সঠিক মাসয়ালা পেশ করতেন। যার ফলে ইসলামে সর্বকালের সর্বযুগের সমাধান এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে, যার গ্রহণযোগ্যতা সকল যুগে সমভাবে বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পাঠ
মাযহাবের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

মাযহাব (مَذْهَبٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে মত, পথ, দল ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় ফকিহ ইমামগণ চিন্তা-গবেষণা করে মাসয়ালা নির্ধারণের ব্যাপারে যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন ও বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন, তার প্রতিটি পৃথক পৃথক সমষ্টিকে মাযহাব বলে।

ইসলামের যে সব মৌলিক বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে সে সকল ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে কোনো দ্বিমত বা মতপার্থক্য নেই। তবে মতপার্থক্য রয়েছে শরিয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে। আর এ মতভেদ থাকা স্বাভাবিক। কারণ ইসলাম মৌলিক বিষয় ঠিক রেখে স্বাধীন, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধি বৃত্তিকে সমর্থন ও উৎসাহিত করেছে।

ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ি, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বল (رحمهم الله) ছিলেন ঐসকল ভাগ্যবান ব্যক্তিদের সর্বশীর্ষে, যাঁরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করেছেন কুরআন-সুন্নাহর গভীর গবেষণায়। যার ফলাফল মুক্তা মালার ন্যায় সাধারণ মানুষের নিকট উপস্থাপিত হয়। উক্ত ইমামগণের গবেষণার মৌলিক দর্শন ও সমস্যাবলির সমাধানগুলোই মূল চার মাযহাবে বিন্যস্ত।

মৌলিকভাবে কুরআন ও হাদিসের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য না থাকলেও এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে এবং বর্ণনা ও নির্ভরযোগ্যতায় ইমামদের মতপার্থক্যের কারণ থেকেই বিভিন্ন মাযহাবের উৎপত্তি হয়েছে। পরবর্তীতে ঐ ইমামগণের নামানুসারে মাযহাবসমূহের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করে। যেমন হানাফি, শাফেয়ি, মালেকি, হাম্বলি ইত্যাদি।

৬। জামাল সাহেবের উচিত হচ্ছে -

i. ইজতিহাদ করা

ii. তাকলিদ করা

iii. ইলমে ফিক্‌হ মানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শফিক একটি মাসয়ালার সমাধানের জন্য ফিক্‌হের কিতাব খোঁজ করে। তার বন্ধু আসিফ এ দৃশ্য দেখে বলে, যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কুরআন হাদিস খোঁজ করা উচিত। শফিক তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলল, কুরআন হাদিসের গবেষণালব্ধ সমাধান আছে ইলমে ফিক্‌হের মধ্যে।

ক. ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর আসল নাম কী?

খ. فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ (ফকিহ মুজতাহিদ) বলতে কী বোঝ?

গ. আসিফের বক্তব্যটি ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

ঘ. শফিকের উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নাজাসাত
اَلنَّجَاسَةُ

প্রথম পাঠ
নাজাসাত পরিচিতি ও প্রকারভেদ

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অপবিত্রতা, নাপাকি, ময়লা, নোংরা, মলিনতা। এটি তাহারাত (طَهَارَةٌ)-এর বিপরীত শব্দ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় নাজাসাত বলতে এমন বস্তুকে বোঝায়, যাকে শরিয়ত অপবিত্র বলে জানিয়েছে তা পরিহার করা এবং কাপড়ে লাগলে ধুয়ে ফেলা। যেমন : মল-মূত্র, রক্ত ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের উপর প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপবিত্র অবস্থায় এ সকল ইবাদত কবুল হয় না। সালাত, বায়তুল্লাহ তাওয়াফ, কুরআন স্পর্শ প্রভৃতি ইবাদতের জন্য শরীর, পোশাক ও ইবাদতের স্থানকে নাজাসাত মুক্ত রাখা শর্ত।

নাজাসাত (نَجَاسَةٌ) প্রধানত দু প্রকার। যথা–

(ক) নাজাসাতে হাকিকি (نَجَاسَةٌ حَقِيْقِيَّةٌ) বা প্রকৃত নাপাকি

(খ) নাজাসাতে হুকমি (نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ) বা বিধানগত নাপাকি

(ক) নাজাসাতে হাকিকির পরিচিতি :

نَجَاسَةٌ শব্দের অর্থ নাপাকি আর حَقِيْقِيَّةٌ-এর অর্থ প্রকৃত, বাস্তব। নাজাসাতে হাকিকি বলতে নাপাকির এমন এক অবস্থা বোঝায়, যা দেখা যায় এবং যা সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং যে সব নাপাকি থেকে মানুষ নিজের শরীর, জামাকাপড় ও সমস্ত ব্যবহার্য জিনিসপত্র রক্ষা করতে চায়। যেমন : পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদ ইত্যাদি।

ইসলামি শরিয়ত এ সব থেকে দূরে থেকে পাক-পবিত্র থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

(খ) নাজাসাতে হুকমির পরিচিতি

نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ-এর অর্থ বিধানগত নাপাকি। যে সব অপবিত্রতা প্রকাশ্যে দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি শরিয়ত এগুলোকে অপবিত্র হিসেবে সিদ্ধান্ত দিয়েছে, সেগুলোকে نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ বলা হয়। যেমন : অজুবিহীন অবস্থায় থাকা, গোসলের প্রয়োজন হওয়া।

নাজাসাতের বিধান

উভয় প্রকার নাজাসাতের হুকুম হচ্ছে শরিয়ত কতৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তা থেকে পবিত্র হতে হবে। অপবিত্র অবস্থায় থাকা কোনো মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না। অজু ছাড়া সালাত আদায় ও কুরআন স্পর্শ করা বৈধ নয়। তাই নাজাসাত থেকে পবিত্র থাকা ইমানি দায়িত্ব।

নাজাসাতে হাকিকির প্রকার

নাজাসাতে হাকিকি আবার দু প্রকার। যথা–

(ক) اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ (কঠিনতর অপবিত্র)।

(খ) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ (সহজতর অপবিত্র)।

اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল নাপাক বা অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সন্দেহাতীতভাবে অপবিত্র, সেগুলোকে নাজাসাতে গালিজা বলে। যেমন : পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি।

এ প্রকারের নাজাসাত শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে থাকলে, তা পাক না করলে সালাত জায়েয হবে না, (শরয়ি ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)। শরয়ি ওজর বলতে এমন সময় বা স্থানে শরীরে নাপাক লাগাকে বোঝায়, যা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই বা নাপাক লাগা কাপড় ছাড়া বিকল্প কাপড় নেই। এ অবস্থায় নাপাক লেগে থাকলেও তা নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ-এর পরিচয় ও হুকুম

যে সকল বস্তু অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, অপেক্ষাকৃত হালকা ও সহজতর, সেগুলোকে নাজাসাতে খফিফা বলে। যেমন : হালাল প্রাণীর পেশাব, হারাম পাখির মল ইত্যাদি।

এ জাতীয় অপবিত্রতা শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশের এক চতুর্থাংশ স্থানে লাগলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা নিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হবে। প্রকাশ থাকে যে, নাপাকি যত সামান্য হোক না কেন বিনা ওজরে তা নিয়ে সালাত আদায় করা উচিত নয়।

নাজাসাতে গালিজার একটি তালিকা

১. শূকর ও কুকুরের প্রতিটি বস্তুই নাজাসাতে গালিজা।

২. মানুষের পেশাব-পায়খানা।

৩. মানুষ অথবা পশুর রক্ত।

৪. বমি (যে কোনো বয়সের মানুষের হোক)

৫. ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্ত বা পুঁজ অথবা অন্য কোনো তরল পদার্থ।

৬. যে সব পশুর ঝুটা নাপাক তাদের ঘাম ও লালা।

৭. যবেহ ছাড়া মৃত পশুর গোশত ও চর্বি।

৮. নাপাক বস্তু থেকে নির্গত নির্যাস।

৯. মদ ও এ জাতীয় অন্যান্য তরল মাদক দ্রব্য।

নাজাসাতে খফিফার একটি তালিকা

১. হালাল পশুর পেশাব। যেমন : গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি।

২. হারাম পাখির মল। যেমন : কাক, চিল, বাজ। কিন্তু বাদুরের পেশাব পায়খানা পাক।

৩. ঘোড়ার পেশাব।

৪. হালাল পাখির পায়খানা যদি দুর্গন্ধযুক্ত হয়।

৫. নাজাসাতে খফিফা যদি নাজাসাতে গালিজার সাথে মিশে যায় তাহলে নাজাসাতে গালিজার পরিমাণ যত কমই হোক বা বেশি হোক তখন সব নাজাসাতে গালিজার হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ
নাজাসাতযুক্ত পানির বিধান

(ক) নাপাক পানি : যেমন : প্রবাহমান পানিতে নাপাকি পড়ে যদি পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য রঙ, স্বাদ ও গন্ধ বদলে ফেলে, তবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আবদ্ধ অনেক পানি কিন্তু নাপাকি পড়ার কারণে পানির রং স্বাদ ও গন্ধ বদলে গেছে অথবা আবদ্ধ পানিতে নাজাসাত পড়েছে কিন্তু তার দ্বারা পানির রং, স্বাদ ও গন্ধে কোনো পরিবর্তন আসেনি, সে সব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয নয় এবং তা দিয়ে কোনো নাপাক বস্তু পবিত্র করা যাবে না।

মধু, শরবত নাপাক হলে অনুরূপ পানি দিয়ে তিনবার জ্বাল দিলে তা পাক হযে যাবে। নাপাক তৈল মাথায় বা শরীরে মালিশ করলে তিনবার ধুয়ে শরীরকে পবিত্র করা যায়।

(ঘ) কুকুরের উচ্ছিষ্ট

কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক। কিন্তু যে পাত্রে বা প্লেটে কুকুর মুখ লাগিয়েছে তা তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়। তবে শেষ বার মাটি দ্বারা তা ভালোভাবে মাড়িয়ে তারপর ধৌত করার কথা হাদিস শরিফে বলা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করেছে যে, কুকুরের লালাতে যে বিষাক্ত জীবাণু রয়েছে মাটি দ্বারা মাড়িয়ে তারপর পানি দ্বারা ধৌত করলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

ইসতিনজা ও পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি

ইসতিনজা (اِسْتِنْجَاءٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ নিষ্কৃতি লাভ করা, নিরাপদ হওয়া, বেঁচে যাওয়া, অপবিত্রতা দূর করা, মলমূত্র ত্যাগ করা।

ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, পেশাব-পায়খানার পর পবিত্রতা অর্জনকে اِسْتِنْجَاءٌ বলা হয়। ইসলামি শরিয়তে ইসতিনজার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসতিনজা থেকে পবিত্রতা অবলম্বনে অবহেলা করা বড় ধরণের কবিরা গুনাহ। যেমন পেশাবের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে না থাকাকে মহানবি (ﷺ) কবরের আযাবের কারণ বলে হাদিসে উল্লেখ করেছেন।

মহানবি (ﷺ) বলেন– اَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِى الْبَوْلِ

অর্থ : বেশিরভাগ কবর আযাবের কারণ হলো পেশাব। (মুসনাদে আহমদ)।

পেশাব-পায়খানা থেকে পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি

ইসতিনজার নিয়ম ও পদ্ধতি নিম্নরূপ–

১। কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা ত্যাগ না করা। কারণ কিবলাকে সম্মান করা ইমানের অঙ্গ। শরিয়তের বিধান মতে ফরয। রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرُوْهَا.

অর্থ : তোমরা পেশাব-পায়খানার সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে দিয়ে বসবে না।

২। গর্তে বা শক্ত স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৩। ছায়াদানকারী গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের ঘাটে ও ফলবান গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা।

৪। জনসাধারণের চলাফেরার রাস্তায়, কবরস্থানে পেশাব-পায়খানা না করা।

৫। দাঁড়িয়ে পেশাব-পায়খানা না করা।

৬। পেশাব-পায়খানা করার সময় বিনা কারণে কথা না বলা।

৭। টয়লেটে প্রবেশ করার ও বের হওয়ার দোআ পড়া।

৮। মাথায় যে কোনো ধরনের কাপড় দিয়ে টয়লেটে যাওয়া এবং জুতা পায়ে রাখা।

৯। পেশাব-পায়খানা করার সময় সম্পূর্ণ সতর না খুলে প্রয়োজনীয় অংশ খোলা।

১০। টয়লেটে প্রবেশ করার পূর্বে নিম্নোক্ত দোআ পড়ে আগে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা–

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَ الْخَبَائِثِ

অর্থ : হে আল্লাহ আমি পুরুষ শয়তান ও নারী শয়তানের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১১। টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হয়ে নিম্নোক্ত দোআ পড়া–

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّی الْاَذٰی وَ عَافَانِیْ

অর্থ : আমি তোমার ক্ষমা প্রত্যাশী। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার কষ্ট দূর করেছেন এবং আমাকে শান্তিদান করেছেন।

১২। টয়লেট পেপার/কুলুখ ব্যবহার করা। পেশাব-পায়খানা করার পর প্রয়োজন অনুযায়ী টয়লেট পেপার বা মাটির ঢিলা দিয়ে মলদ্বার ভালো ভাবে পরিষ্কার করে তারপর পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নত। টয়লেট পেপার বা ঢিলা পাওয়া না গেলে শুধু পানি দিয়েও পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

১৩। হাড়, কয়লা, কাঁচ, লোহা, তামা, পিতল, অথবা এমন কঠিন ধাতু যা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করলে মলদ্বারে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এমন সব কঠিন বস্তু ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৪। মানুষ ও পশু যে সব বস্তু থেকে উপকার লাভ করে এবং যে সব বস্তুর সম্মান করা জরুরী। সে সব বস্তু ঢিলা, কুলুখ হিসেবে ব্যবহার করা নিষেধ।

১৫। নাপাকি মলদ্বারের বাইরে ছড়িয়ে না পড়লে ঢিলা, কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর ছড়িয়ে পড়লে ফরয।

১৬। শৌচ কাজ বাম হাত দ্বারা করতে হবে এবং এরপর সাবান বা মাটি দ্বারা উত্তমভাবে হাত ধৌত করতে হবে।

১৭। পবিত্রতার জন্য মাটির ঢিলা ব্যবহার করা ভালো। আর তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে টয়লেট পেপার তবে ব্যবহারের সাথে সাথে পানি দিয়ে ভালভাবে ধূয়ে পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে পরিষ্কার করা উচিত। পেশাবের পর টয়লেট পেপার ব্যবহারের সময় ততটুকু সময় দিতে হবে যেন পরে ফোটা ফোটা পেশাব বের না হয়।

পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটির চাকা, পাথরের টুকরা বা টয়লেট পেপার ব্যবহারকে ইস্তেজমার বলে। اَلْاِسْتِجْمَارُ অর্থ কুলুখ ব্যবহার করা। কমপক্ষে তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। পুরুষ শীতকালে প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করবে। গ্রীষ্মকালে প্রথমে পেছন দিক থেকে এরপর সামনের দিক থেকে তারপর পেছনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। মহিলাদের সবসময় প্রথমে সামনের দিক থেকে এরপর পেছনের দিক থেকে তারপর সামনের দিক থেকে ঢিলা ব্যবহার করতে হবে। পেশাবের পর পুরুষ কুলুখ ব্যবহার করবে। এক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখতে হবে। এমন অবস্থা করা যাবে না যাতে অন্যদের অসুবিধা বা অস্বস্তি ও হাসির কারণ হয়।

তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি

তাহারাত অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো–

১। অজু : যার মাধ্যমে মুখমন্ডল, হাত, পা মাথাসহ পুরো দেহ পবিত্র হয়ে যায়।

২। তায়াম্মুম: অসুস্থ হলে বা পানি পাওয়া না গেলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুমের নিয়ত করে মুখ ও হাত মাসেহ করার মাধ্যমে পবিত্র করা যায়।

৩। গোসল : গোসলের মাধ্যমে গোটা শরীর পবিত্র করা যায়।

৫। শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে পানি ও সাবান বা পাউডার দিয়ে তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায়। তবে সে সাবান ও পাউডার পবিত্র উপাদানে তৈরি হতে হবে।

তাহারাতের আরেক দিক হলো মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন খালেসভাবে অতীতের গুনাহের জন্য তওবা করা। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ঠিকমতো আদায় করা। হারাম ও মাকরুহ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা। আত্মিক উন্নতির জন্য বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ পাঠ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

যদি কোনো সাবান ও কাপড় ধোয়ার পাউডারে শুকরের চর্বি থাকে, তবে সেগুলো ব্যবহার না করাই উচিত। কারণ শুকরের চর্বি নাপাক, যা কাপড় ও শরীরকে নাপাক করবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোন প্রাণীর চামড়া নাপাক?

ক. উট খ. মহিষ
গ. ছাগল ঘ. শুকর

২। পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. নফল

৩। اِسْتِنْجَاءٌ শব্দটির অর্থ কী?

ক. পবিত্র হওয়া খ. ইচ্ছা করা
গ. সংকল্প করা ঘ. গোপন করা

৪। তায়াম্মুম করতে হয়, যিনি–

i. মারাত্মক অসুস্থ
ii. পানি ব্যবহারে অক্ষম
iii. অজুর নিয়ম না জানলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সেলিম সালাত আদায় করে। কিন্তু পেশাব করার পর ঢিলা ব্যবহার করে না।

৫। সেলিমের কাজটি কোন ধরনের গুনাহ?

ক. কবিরা খ. শিরকি
গ. সগিরা ঘ. নেফাকি

আলতাফ সাহেব বৃদ্ধ ও অসুস্থ। অজুতে পানি ব্যবহার করলে অসুখ বেড়ে যায়। তাই তিনি একটি কাঠের টুকরার উপরে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন।

৪। আলতাফ সাহেবের তায়াম্মুমের হুকুম কী?

ক. صَحِيْحٌ খ. بَاطِلٌ

গ. فَاسِدٌ ঘ. مَكْرُوْهٌ

৫। আলতাফ সাহেবের উচিত হচ্ছে -

i. শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তায়াম্মুম করা

ii. মাটি জাতীয় বস্তু ব্যবহার করা

iii. সুস্থ হলে অজু করে সালাত আদায় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মামুনের দাদি বৃদ্ধা ও খুবই অসুস্থ। পানি দ্বারা অজু করলে তার অসুখ আরো বেড়ে যায়। তথাপিও তিনি অজু করে সালাত আদায় করেন। একদিন অজু করার পর তার অবস্থা মারাত্মক হয়ে যায়। মামুন দাদিকে বলে দাদি! তুমি তো অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পার।

ক. تَيَمُّمٌ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. তায়াম্মুম করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

গ. মামুনের দাদির কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মামুনের বক্তব্য সঠিক কিনা? দলিলসহ তোমরা মতামত দাও।

তৃতীয় পাঠ
মেসওয়াক
اَلسِّوَاكُ

মেসওয়াকের পরিচয়

মেসওয়াক (مِسْوَاكٌ) শব্দটি س و ك ধাতু থেকে নির্গত। হাদিস শরিফে اَلسِّوَاكُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ মাজা, ঘষা, দাঁত মর্দন ও দাঁত পরিষ্কারকরণ। যে বস্তু দিয়ে তা করা হয়, তাকে مِسْوَاكٌ বলা হয় ।

পরিভাষায় মেসওয়াক বলা হয়, গাছের ডাল বা শিকড়কে, যা দিয়ে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার করা হয়। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلسِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ.

অর্থ : মেসওয়াক করলে যেমন মুখ পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধমুক্ত হয়, তেমনি এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

প্রিয় রসুল (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

لَوْ لاَ ان اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وَضُوْءٍ.

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কষ্টদায়ক হবে মনে না করলে আমি প্রত্যেক অজুর সময়ই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম। (সহিহ বুখারি ও সহিহ ইবনি খুজাইমা)

হজরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

فَضْلُ الصَّلَاةِ الَّتِيْ يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا.

অর্থ : মেসওয়াক করে যে সালাত আদায় করা হয় সে সালাতে মেসওয়াকবিহীন সালাতের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি ফযিলত রয়েছে। (বায়হাকি ও মিশকাত)

হজরত আলি (রা.) বলেন- মেসওয়াক দ্বারা মস্তিষ্ক সতেজ হয়।

মেসওয়াকের মধ্যে থাকে ফসফরাস জাতীয় পদার্থ। পীলু বৃক্ষের ডালে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস অধিক পরিমাণে থাকে। মেসওয়াকের ফলে বিশেষ করে পীলু গাছের মেসওয়াক মুখে স্বাদ ফিরিয়ে আনে, টন্সিল রোগীর জন্য মহৌষধ।

মেসওয়াকের আকৃতি

তিক্ত বৃক্ষের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়, দাঁতের মাড়ি শক্ত হয় এবং হযম শক্তি বৃদ্ধি পায়। যায়তুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করা উত্তম। পিলু, বাবলা, কানি গাছের মেসওয়াক স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। নীম গাছের ডাল দাঁতের জন্য উপকারী হলেও শরীরের শক্তি হ্রাস করে।

মেসওয়াক তাজা, কনিষ্ট আঙ্গুলের ন্যায় মোটা ও এক বিঘত পরিমাণ দীর্ঘ হতে হবে। হাতের আঙ্গুল মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হয় না। তবে মেসওয়াক পাওয়া না গেলে ডান হাতের আঙ্গুল বা শক্ত কাপড়ের অংশ মেসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। (আলমগিরি)

মেসওয়াক যেন খুব শক্ত কিংবা খুব নরম না হয়ে বরং মাঝামাঝি হওয়া উত্তম। এক বিঘতের চেয়ে কম হওয়া অনুচিত। ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে গেলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। (ফাতাওয়ায়ে শামী)

মেসওয়াক করার পদ্ধতি

মেসওয়াকের মাসনূন তরিকা হলো- ডান হাতে এভাবে ধারণ করতে হবে যেন কনিষ্ট আঙ্গুলি থেকে মেসওয়াকের নিম্ন অংশের নিচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী মেসওয়াকের উপরের অংশের নিচের দিকে ও অন্যান্য আঙ্গুলগুলো মেসওয়াকের উপরে থাকে। মুখের ডান দিক থেকে শুরু করা এবং দাঁতের প্রস্থের দিক থেকে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব; লম্বালম্বিভাবে নয়। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, সালাতের অজু করার পূর্বে, মজলিসে যাওয়ার পূর্বে এবং কুরআন ও হাদিস তেলাওয়াত করার পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ)

অজুর সময় কুলি করার পূর্বে মেসওয়াক করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। অন্যান্য সময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব। সাওম পালনকারীর জন্য সকাল-সন্ধ্যা যে কোনো সময়ে মেসওয়াক ব্যবহারে কোনো অসুবিধে নেই; তবে ব্রাশ করা অনুচিত।

ব্রাশ ব্যবহার

মেসওয়াক না থাকা অবস্থায় কেউ যদি টুথ ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করে তাতে দাঁত পরিষ্কার হবে, পরিচ্ছন্নতার সওয়াব হবে তবে মেসওয়াকের যে সওয়াব তা পাবে না। যে সব টুথ ব্রাশ শুকরের পশম বা অন্য কোনো নাপাক অথবা হারাম বস্তু দ্বারা তৈরি করা হয় ঐ সব ব্রাশ ব্যবহার করা জায়েয নয়। মেসওয়াক না হলেও ব্রাশ এবং পেস্ট যদি হালাল বস্তু দিয়ে তৈরি হয় তাতে দাঁতের উপকার ও দুর্গন্ধ দূর হওয়াতে মনের প্রশান্তি লাভ হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন শব্দ থেকে مِسْوَاكٌ শব্দটি নির্গত হয়েছে?

ক. اَسْوَاكٌ খ. سِوَاكٌ

গ. سُوْكٌ ঘ. سَوِيْكٌ

২। অজুর ক্ষেত্রে মেসওয়াক করার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩। মেসওয়াক করলে -

i. মস্তিষ্ক সতেজ হয়

ii. মুখ দুর্গন্ধমুক্ত হয়

iii. আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i,ii ও iii

রাশেদ কুরআন তেলাওয়াত করবে। এজন্য সে যয়তুনের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করে অজু করে

৪। রাশেদের মেসওয়াক করার হুকুম কী? ।

ক. সুন্নত খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৫। এভাবে মেসওয়াক করায় রাশেদের -

i. মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে

ii. দাঁতের মাড়ি শক্ত হবে

iii. হযম শক্তি বৃদ্ধি পাবে

সৃজনশীল প্রশ্ন

মাওলানা আব্দুর রহমান ঢাকায় এক মসজিদে আসরের সালাত আদায় করতে যান। সেখানে তিনি দেখেন, মুয়াজ্জিন ইকামত দেওয়ার পূর্বেই মুসল্লিগণ সালাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে। তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, মুয়াজ্জিন ইকামতে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوة বললে মুসল্লিদের জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

ক. ইকামতের মধ্যে কয়টি বাক্য কয়বার বলতে হয়?

খ. اِقَامَةٌ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুসল্লিগণের কাজটি ইলমে ফিক্‌হের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আব্দুর রহমানের বক্তব্যটি ইলমে ফিক্‌হের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আস সালাত

اَلـصَّلَاةُ

প্রথম পাঠ

আহকামুস সালাত

সালাতের গুরুত্ব ও উপকারিতা

সালাত (اَلصَّـلَاةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোআ, রহমত, ইসতিগফার ও তাসবিহ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলতে বোঝায়–

هِيَ عِبَادَةٌ ذَاتُ اَقْوَالٍ وَ اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ : সালাত এমন কিছু সুনির্ধারিত কথা ও কাজবিশিষ্ট ইবাদত, যা তাকবিরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত। ফার্সি ভাষায় সালাতকে নামাজ বলে। ইবাদতের মধ্যে সালাতকে عِمَادُ الدِّيْنِ বা দ্বীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না, তদ্রূপ সালাত ছাড়াও দীন পরিপূর্ণ হয় না। সালাত যে ফরজ তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বালিগ পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ أَتُوْا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّكِعِيْنَ.

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।
(সুরা বাকারা, ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। (সুরা নিসা, ১০৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَ صَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحَجُّوْا بَيْتَ رَبِّكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ طِيْبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ.

অর্থ : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করো, রমযানে সাওম পালন করো, বায়তুল্লাহ শরিফের হজ আদায় করো, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করো; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে সক্ষম হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে, ১/৮৯)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَرَأَيْتُمْ لَوْ اِنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالُوْا لَا يَبْقٰى مِنْ دَرَنِه شَيْءٌ قَالَ فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوْا اللّٰهُ بِهَنَّ الْخَطَايَا .

অর্থ : তোমাদের কি মত! যদি কারো ঘরের দরজায় কোনো নদী থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে নিয়মিত গোসল করে তবে এ গোসলসমূহ তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে দিবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন- 'না তার দেহে কোনো ময়লাই থাকতে দেবে না'। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন- 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও ঠিক তদরূপ। আল্লাহ এ সকল সালাতের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ খাতা দূর করে দেবেন'। (সহিহ বুখারি)

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব বলতে ঐ সব করণীয় বিষয় বোঝায়, যার কোনো একটিও ভুলক্রমে বাদ গেলে 'সাজদায়ে সাহু' আদায় করতে হয়।

সালাতের ওয়াজিব অনেক, এর মধ্যে অন্যতম হলো ১৪ টি। যথা–

১। ফরজ সালাতের প্রথম দুই রাকাতে এবং বেতের, সুন্নত ও নফল সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতেহা পাঠ করা।

২। সুরা ফাতেহার সাথে সুরা মিলানো।

৩। রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৪। দুই সাজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৫। তিন ও চার রাকাতবিশিষ্ট সালাতে দুই রাকাতের পর বসা।

৬। প্রথম ও শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়া।

৭। ইমামের জন্য কিরাআত ওয়াক্ত অনুযায়ী আস্তে এবং জোরে পড়া।

৮। বেতেরের সালাতে দোআয়ে কুনুত পড়া।

৯। দুই ইদের সালাতে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।

১০। ফরয সালাতে প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারিত করা।

১১। প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতিব ঠিক রাখা।

১২। প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতিব ঠিক রাখা।

১৩। 'তাদিলে আরকান' অর্থাৎ রুকু, সাজদা, দাঁড়ানো, বসায় কমপক্ষে এক তাসবিহ পরিমাণ স্থির থাকা।

১৪। সালাম বলে সালাত শেষ করা।

সালাতের সুন্নতসমূহ

সালাতের সুন্নতে মুয়াক্কাদা ১৬টি। যথা–

১। তাকবিরে তাহরিমা বলার পূর্বে পুরুষের কানের লতি এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত দুহাত উঠানো।

২। তাকবিরে তাহরিমা বলেই পুরুষের নাভির নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা।

৩। তাকবিরে তাহরিমার সময় মস্তক অবনত না করা।

৪। ইমামের জন্য তাকবির উচ্চস্বরে বলা।

৫। সানা পড়া।

৬। প্রথম রাকাতে সানার পর أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়া।

৭। প্রত্যক রাকাতে সুরা ফাতেহার পূর্বে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ পড়া।

৮। সুরা ফাতেহার শেষে আমিন বলা।

৯। ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধুমাত্র সুরা ফাতেহা পড়া।

১০। সানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও আমিন আস্তে পড়া।

১১। প্রত্যেক উঠা বসায় اَللهُ أَكْبَرُ বলা।

১২। রুকুর তাসবিহ পড়া ।

১৩। রুকু থেকে উঠার সময় سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ পড়া।

১৪। সাজদার তাসবিহ পড়া।

১৫। দরুদ শরিফ পড়া।

১৬। দোআয়ে মাসুরা পড়া।

৬। প্রথম বৈঠকের ভুল স্মরণ হওয়ার পর মাহিরের করণীয় ছিল -

i. স্মরণ হওয়া মাত্রই প্রথম বৈঠক করা

ii. সালাত ছেড়ে পুনরায় সালাত পড়া

iii. সাজদায়ে সাহু দিয়ে সালাত শেষ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তানভীর দাখিল সপ্তম শ্রেণির একজন ছাত্র। তাদের ঘর তৈরি করতে যেয়ে তার পিতা বললেন, খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর তৈরি হয় না তদ্রূপ সালাত ছাড়া দীন পরিপূর্ণ হয় না। এ কথা শুনে তার মা বলে উঠলেন সালাত আদায় না করলে তো মুমিন হিসেবে পরিচয় দেওয়া যায় না।

ক. اَلصَّلٰوةُ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. সালাতের মধ্যে قِيَامٌ এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. তানভীরের পিতার বক্তব্য ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মায়ের উক্তিটির যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিরূপণ কর।

২। আতিক সাহেব অসুস্থতার কারণে বসে ইশারায় আসরের সালাত আদায় করছেন। এ মুহূর্তে আরমান সাহেব এসে দেখলেন- তিনি বসে সালাত আদায় করছেন। সালাত শেষে তিনি আতিক সাহেবকে বললেন, সালাতের মধ্যে কিয়াম করা ফরয। আর ফরয আদায় ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং, আপনার সালাত সঠিক হয় নাই।

ক. সাজদার মধ্যে পঠিত তাসবিহটি লেখ।

খ. সালাতে সালাম ফিরানোর বিধান বর্ণনা কর।

গ. আরমান সাহেবের বক্তব্যটি ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আতিক সাহেবের কাজটির যথার্থতা ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ
সালাতের কিরাত
اَلْقِـرَأَةُ فِـى الصَّلَاةِ

কিরাতের পরিচয় ও হুকুম

কিরাত (اَلْقِرَأَةُ) অর্থ পাঠ করা। ব্যবহারিক অর্থে সালাতে পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কিরাত বলা হয়। সুতরাং اَلْقِرَاةُ فِى الصَّلَاةِ-এর অর্থ হলো, সালাতে কুরআন মাজিদ পাঠ করা।

কুরআন মাজিদের সুরাগুলো যে তারতিব বা ক্রমানুসারে লেখা আছে, সালাতের মধ্যে উক্ত তারতিব অনুসারেই পাঠ করতে হবে। জেনে বুঝে পরের সুরা আগে এবং আগের সুরা পরে পাঠ করা ঠিক নয়। সালাতের মধ্যে সব সময় একই সুরা নির্দিষ্ট করে পড়া মাকরুহ। বিনা ওযরে একই সুরার কয়েক জায়গা থেকে কয়েক আয়াত পড়া মাকরুহ।

সালাত যেমন ফরয, সালাতে কিরাত পড়াও ফরয। তাই কিরাত বিশুদ্ধভাবে পড়তে জানাও ফরয। তেলাওয়াত সহিহ শুদ্ধ না হলে সালাত শুদ্ধ হবে না।

যে সকল ভুলের কারণে অর্থের বিকৃতি ঘটে, এ ধরনের ভুলকে لَحْـنٌ جَـلِيٌّ (প্রকাশ্য বা বড় ভুল) বলে। সালাতের যে কোনো পর্যায়ে لَحْنٌ جَلِيٌّ হয়ে গেলে, সালাত বাতিল হয়ে যায়।

অশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী সম্পর্কে রসুল (ﷺ) বলেন–

رُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنَ وَالْقُرْانُ يَلْعَنُه

অর্থ : অনেক কুরআন তেলাওয়াতকারী রয়েছে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করে, আর কুরআন তাদেরকে লানত করে।

কিরাআতের পরিমাণ

সালাতের মধ্যে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ পাঠ করা ওয়াজিব। জামাআতে সালাত আদায়কালে ইমামের পিছনে মুক্তাদির কিরাআত পাঠ করা ফরয নয় বরং কিরাত পড়া নিষেধ। কেননা রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قِرَأَةُ الْإِمَامِ قِرَاةٌ لَّـهُ

অর্থ : ইমামের কিরাতই মুক্তাদির কিরাআত।

তৃতীয় পাঠ

কাযা সালাত

صَلَاةُ الْقَضَاءِ

কাযা সালাতের পরিচয়

কাযা (قَضَاءٌ) শব্দের অর্থ পূর্ণ করা। পরিভাষায় ফরয বা ওয়াজিব সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করা না হলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আদায় করাকে কাযা সালাত বলা হয়। কাযা সালাত আদায় করার অনুমতি শরিয়ত দিলেও ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কাযা করা কবিরা গুনাহ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذٰلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থ : যে লোক কোনো সালাত ভুলে যাবে সে যেন পড়ে নেয় যখনই তা স্মরণ হয়। সে জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না, শুধু তাই পড়তে হবে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ করা হয়েছে সালাত কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য। (সহিহ বুখারি)

অপর এক হাদিসে বলা হয়েছে–

اَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا فَإِنَّ كَفَّارَتُهَا اَنْ يُّصَلِّيْهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

অর্থ : কিংবা যদি সালাত সম্পর্কে বেখেয়াল হয়ে যায়, তাহলে তার কাফফারা হলো যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিতে হবে। (সুনানু নাসায়ি)

কাযা সালাতের পদ্ধতি

ফরয সালাতের কাযা ফরয এবং ওয়াজিব সালাত যেমন- বেতেরের কাযা ওয়াজিব। মান্নত করা সালাতের কাযাও ওয়াজিব। নফল সালাত আরম্ভ করার পর তা ওয়াজিব হয়ে যায়। কোনো কারণ বশতঃ নফল সালাত নষ্ট হয়ে গেলে বা কোনো কারণ বশতঃ শুরু করার পর ছেড়ে দিলে তার কাযা করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

যদি কারো কয়েক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে থাকে, তবে যথাশীঘ্র সব সালাত এক ওয়াক্তেই কাযা আদায় করতে পারলে তা উত্তম। যে ওয়াক্তের সালাত তা সে ওয়াক্তেই কাযা করতে হবে, তেমন

জরুরি নয়। কাযা সালাত পড়ার কোনো সময় নির্ধারিত নেই। তবে মাকরুহ ও হারাম ওয়াক্তে আদায় করা যাবে না।

কয়েকজনের একই সাথে সালাত কাযা হয়ে গেলে, সম্ভব হলে তাদের জামাতের সাথে কাযা আদায় করা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

সফরকালীন সময়ের কাযা সালাত মুকিম অবস্থায় আদায় করলে কসর আদায় করতে হবে। অনুরূপ মুকিম অবস্থায় কাযা সালাত সফরে পড়লে পূর্ণই পড়তে হবে।

কারো পাঁচ ওয়াক্তের বেশি সালাত কাযা হলে তার ক্রমানুসারে কাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। তবে ছয় ওয়াক্তের কম কাযা হলে, তারতিব রক্ষা করে ক্রমানুসারে তা কাযা করা জরুরি।

(শামী ১/৫৩৪)

যখন সালাত কাযা করা বৈধ

১। **শত্রুর ভয় :** মুসাফির যদি চোর ডাকাতের ভয় করে এবং সালাত আদায় অবস্থায় নিজ মাল ও আসবাব পত্রের হিফাযত করা তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে সে সালাত কাযা করতে পারে।

২। **সন্তান প্রসবকালে :** ধাত্রীর জন্য সালাত বিলম্বিত করার অনুমতি রয়েছে। যদি সালাত আদায়ের ফলে তার অনুপস্থিতিতে সন্তানের মৃত্যু বা তার কোনো অঙ্গহানির বা সন্তানের মা মারা যাওয়ার অথবা কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তাহলে ধাত্রী তখন সালাত আদায় না করে পরবর্তী সময়ে কাযা আদায় করবে।

৩। **ঘুমিয়ে থাকা :** কেউ যদি ঘুমিয়ে থাকে এবং ওয়াক্ত চলে যাবার পর তার ঘুম ভাঙ্গে, তার এই সালাত কাযা আদায় করা ফরয।

৪। **সালাতের কথা ভুলে যাওয়া :** কেউ যদি সালাতের কথা একেবারে ভুলে যায় এবং পরে মনে পড়ে তাহলে তার এ সালাতও কাযা আদায় করা ফরজ।

কাযা সালাতের নিয়ত

নমুনা স্বরূপ ফজরের দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ الْفَائِتَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

বেতেরের রাকাত সংখ্যা

বেতেরের সালাত তিন রাকাত। অধিকাংশ সাহাবি ফকিহ তিন রাকাত পড়তেন। হজরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) তিন রাকাত বেতের সালাত আদায় করতেন এবং একেবারে শেষ রাকাত পড়ে সালাম ফিরাতেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

বেতের আদায়ের উত্তম সময় ও বৈধ সময়

হজরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবি (ﷺ) বলেছেন, যার শেষরাতে জাগ্রত না হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, সে যেন প্রথম রাতেই বেতের সালাত আদায় করে নেয়। আর যার শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস আছে, সে যেন শেষ রাতেই বেতের আদায় করে। কেননা শেষ রাতের সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকেন। আর এটাই হলো উত্তম। (সহিহ মুসলিম)

দোআ কুনুত

বেতের সালাতে দোআ কুনুত পড়া ওয়াজিব। এ কুনুত তিন রাকাত বেতের সালাতের শেষ রাকাতে কিরাত পড়ার পর তাকবির বলে রুকুতে যাওয়ার আগেই পড়তে হয়।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) রুকু করার পূর্বে দোআ কুনুত পড়তেন। (দারে কুতনি)

হজরত আলি (রাঃ) বলেন–

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ.

অর্থ : রসুলে করিম (ﷺ) বেতের সালাতের শেষ রাকাতে দোআ কুনুত পাঠ করেছেন।

দোআ কুনুত নিম্নরূপ–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনারই সাহায্য প্রার্থী এবং একমাত্র আপনার কাছেই ক্ষমা প্রার্থী। আপনার উপর আমরা ইমান এনেছি এবং আপনার উপরই ভরসা রাখি। আমরা আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার শুকরিয়া আদায় করি। যারা আপনার নাফরমানী করে তাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছি। হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি, আপনার জন্যই সালাত আদায় করি এবং আপনার উদ্দেশ্যেই সাজদা করি, আপনার দিকেই দ্রুত ধাবিত হই, আপনার হুকুম পালনের জন্যই প্রস্তুত থাকি, আপনার দয়ার আশা করি, আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিঃসন্দেহে আপনার শাস্তিভোগ করবে কাফির সম্প্রদায়।

কারো দোআ কুনুত মুখস্থ না থাকলে, মুখস্থ করে নিতে হবে। দোআয়ে কুনুত মুখস্থ না হওয়া পর্যন্ত নিম্নোক্ত দোআ পড়লে চলবে–

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দিন আর জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান। (সুরা বাকারা, ২০১)

এ দোআও জানা না থাকলে তিনবার পড়তে হবে– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন।

অথবা তিনবার পড়তে হবে يَا رَبِّ (অর্থ : হে প্রভু!)।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বেতেরের সালাত কয় রাকাত?

ক. এক খ. তিন
গ. পাঁচ ঘ. সাত

২। বেতেরের সালাতে দোআ কুনুত পড়ার হুকুম কী?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩। বেতেরের সালাত আদায় করতে হয়, কারণ ইহা -

i. আদায় করা ওয়াজিব
ii. অত্যধিক ফযিলতপূর্ণ
iii. আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

রাসেল বলে, আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। বেতর হচ্ছে অতিরিক্ত তাই এ সালাত পড়ে না।

৪। রাসেল শরিয়তের কোন বিধান লংঘন করছে?

ক. ফরজ খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৫। রাসেলের করণীয় হচ্ছে -

i. বেতেরের সালাত আদায় করা

ii. আল্লাহর কাছে তওবা করা

iii. উপরোক্ত বক্তব্য বর্জন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

তানিমের দাদা ইশার সালাতের পর সালাত আদায় করতে যেয়ে এক রাকাত আদায় করেন এবং রুকুর পরে দোআ কুনুত পাঠ করেন। তানিম তা দেখে বলল, দাদা আপনি কি সালাত পড়লেন? বেতের সালাততো তিন রাকাত এবং তৃতীয় রাকাতে রুকুর পূর্বে দোআ কুনুত পড়তে হয়। দাদা তানিমকে লক্ষ্য করে বললেন, হাদিসে বেতেরের সালাত এক রাকাত এর কথাও বর্ণিত আছে।

ক. وِتْرٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. সালাতুল বেতের বলতে কী বোঝ?

গ. তানিমের দাদার সালাতকে শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তানিমের বক্তব্যকে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম পাঠ
জানাজা সালাত
صَلَاةُ الْـجَنَازَةِ

জানাজা সালাতের পরিচয়

জানাজা (اَلْجَنَازَةُ) শব্দের অর্থ হলো লাশ। صَلَاةُ الْجَنَازَةِ বা জানাজার সালাত অর্থ হলো মৃত ব্যক্তির জন্য বিশেষ প্রকারের সালাত। জানাজার সালাত ফরজে কেফায়া (فَرْضُ كِفَايَةٌ)। কিছু সংখ্যক লোক এ সালাত আদায় করলেই সকলের ফরজ আদায় হয়ে যায়। কেউ আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হয়।

জানাজা সালাতে ফরয দুইটি। যথা–

(১) তাকবির বা আল্লাহু আকবার চার বার বলা ও

(২) দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

এই সালাতে রুকু ও সেজদা নেই। ওজর ব্যতীত জানাজার সালাত বসে পড়া জায়েয নয়। কোনো কিছুর উপর উঠে সালাত আদায় করাও জায়েয নয়।

জানাজার ওয়াজিব একটি : চতুর্থ তাকবির বলার পর সালাম ফিরানো।

জানাজা সালাতে সুন্নত তিনটি। যথা–

(১) আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানা পড়া।

(২) নবি করিম (ﷺ)-এর উপর দরুদ শরিফ পড়া।

(৩) মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ করা।

মৃত ব্যক্তি যেহেতু আমল করতে পারে না তাই তার জন্য যত বেশি পারা যায় দোআ করা প্রয়োজন। জানাযা সালাতের আগে ও জানাজার পরে, কবরে রেখে যত বেশি তার জন্য দোআ করা যাবে ততই মৃত ব্যক্তি উপকৃত হবে। জানাজা সালাতের পর দোআ করার ক্ষেত্রে হাদিসে ও শরিয়তে নিষেধ করা হয়নি।

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা

জানাজার সালাতে তাকবির সংখ্যা চারটি। প্রত্যেকটি তাকবির এক রাকয়াত সালাতের স্থলাভিষিক্ত। এ সালাতে রুকু সাজদা নেই। প্রথম তাকবিরের পর সানা পাঠ করবে। দ্বিতীয় তাকবিরের পর দরুদ পাঠ করবে। তৃতীয় তাকবিরের পর দোআ পাঠ করবে। চতুর্থ তাকবিরের পর সালাম ফিরাবে।

চতুর্থ তাকবিরের পর (হাত না উঠিয়ে) ইমাম সাহেব সশব্দে আর মুক্তাদি চুপে চুপে চতুর্থ তাকবির বলে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাতুল জানাজা শেষ করবে।

সালাতুল জানাজার পর দোআর বিধান

একজন মানুষ ইন্তেকাল করার পর তার জন্য সব সময় দোআ করাই উত্তম। সালাতুল জানাজাও মূলত মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ। তবে সর্ব বিবেচনায় দোআ নয়। তবে তার মধ্যে নামাযের সাদৃশ্য যেমন আছে, দোআও আছে। বিগলিত মনে একা বা সম্মিলিতভাবে যদি দোআ করা হয় তাতে নিষেধ নেই; বরং মৃত ব্যক্তির জন্য ফায়দা আছে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ.

অর্থ : হজরত আবু হুরায়রা (ﷺ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জানাজার সালাত পড়ার পর খালেসভাবে তাঁর জন্য দোআ করবে। (সুনানু আবু দাউদ)

হজরত আবদুল্লাহ ইবন ওমর (ﷺ) এক ব্যক্তির জানাজার সালাতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে গমন করেন। কিন্তু সালাতে শরিক হতে পারেন নি। অতঃপর তিনি সকলকে সম্বোধন করে বললেন–

إِنْ سَبَقْتُمُوْنِىْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُوْنِيْ بِالدُّعَاءِ

অর্থ : তোমরা জানাজার সালাত আদায় করে ফেলেছ, কিন্তু আমার পূর্বে দোআ করো না। অর্থাৎ, আমাকে সাথে নিয়ে দোআ কর। (সারাখসী, আল মাবসূত)

দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের কাছে অপেক্ষা করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোআ করা ও কিছু কুরআন পড়ে সওয়াব বখশিয়ে দেওয়া মুস্তাহাব।

ইন্তিকালের পর মৃতব্যক্তির আমল করার আর সুযোগ থাকে না। তার নেক সন্তান তার জন্য দোআ করলে, তাতেই সে লাভবান হবে। সন্তানের এ দোআর জন্য সময় বেধে দেওয়া হয়নি। মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে জানাজার পূর্বে, পরে কবরে রাখার সময়, কাফনের পূর্বে ও পরে সব সময় দোআ করা জায়েয।

মৃত ব্যক্তির জন্য দোআ

যারা জীবিত আছেন, তাদের উচিত, তাদের পূর্বসুরী যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের জন্য দোআ করা। বিশেষ করে পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ও ওস্তাদ যারা কবরবাসী হয়েছেন, তাদের মাগফিরাতের জন্য সর্বদা দোআ করা কর্তব্য। এটা জীবিত

ব্যক্তির উপর মৃতব্যক্তির হক বা অধিকার। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার জন্য কিভাবে দোআ করতে হবে পবিত্র কুরআনে সে বিষয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আপনি তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি এমনিভাবে দয়া করুন, যেমনিভাবে তারা উভয়ে আমার প্রতি শিশুকালে দয়া করেছিলেন। (সুরা বনি ইসরাইল, ২৪)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ.

অর্থ : মৃত্যুর পর তিন প্রকারের আমল ব্যতীত মানুষের আমলের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। আর তা হচ্ছে-

(১) সদকায়ে জারিয়া,

(২) তার রেখে যাওয়া ইলম যার দ্বারা তার মৃত্যুর পরও মানুষ উপকৃত হয়,

(৩) নেক ও যোগ্য সন্তান যে তার জন্য দোআ করে। (সহিহ মুসলিম ও জামে তিরমিযি)।

দোআর পদ্ধতি

মৃতব্যক্তির জন্য দোআকে ইসালে সওয়াব (اِيْصَالُ ثَوَابٍ) বা সওয়াব রেসানি বলা হয়। হজরত সুফিয়ান সাওরি (رحمه الله) বলেন: জীবিত লোকেরা যেমন পানাহারের মুখাপেক্ষী অনুরূপ মৃত ব্যক্তিরা দোআর মুখাপেক্ষী। তাই মৃত ব্যক্তিদের জন্য সবসময় দোআ করতে হবে। এটা তাদের প্রতি জীবিতদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

দোআর জন্য দিন-ক্ষণ নির্ধারণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিশেষ দিন ও সময় দোআ করলে তা কবুল হওয়ার আশা করা যায়। যেমন : জুমুয়ার দিনে, আরাফার দিনে, লাইলাতুল বরাত, লাইলাতুল কদর ইত্যাদি।

মৃতব্যক্তি যে দিন ইন্তেকাল করেন সে দিনটি আত্মীয় স্বজনের কাছে স্মৃতি বিজড়িত দিন। ঐ দিন অন্তর নরম থাকে, মা-বাবা বা আত্মীয় স্বজনের জন্য চোখে পানি আসে, অন্য দিন তা হয় না। তাই ঐ দিন কুরআন খতম, মিসকিনদের খাওয়ানো, দোআ ও মিলাদ মাহফিল করলে জীবিতদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তা মনকে আল্লাহমুখী করতে সহায়ক হয়। তবে ঐ দিনই দোআ করতে হবে এমন কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। আর ঐ দিন করলেও শরিয়তে নিষেধ নেই।

কবর যিয়ারতের সুন্নত পদ্ধতি

যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়া মুস্তাহাব। প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার যিয়ারত করা, বিশেষ করে শুক্রবার যিয়ারত করা খুবই উত্তম কাজ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন :

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدَهُمَا فِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَه وَ كُتِبَ بِرًّا.

অর্থ : যে প্রত্যক জুমুয়ার দিন তার পিতা-মাতা অথবা তাদের যে কোনো একজনের কবর যিয়ারত করবে তাকে ক্ষমা করা হবে এবং সদাচরণকারী সন্তানের তালিকাভুক্ত করা হবে। (বায়হাকী)

কবর যিয়ারত করলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। তাতে মন নরম হয় এবং গুনাহের কাজ পরিত্যাগের আগ্রহ জন্মে এবং অন্তর দুনিয়ার মায়া মহব্বত ছেড়ে আখেরাতের দিকে ধাবিত হয়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ اُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قُبُوْرِ اُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَاِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ.

অর্থ : আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে নিষেধ করে ছিলাম, মুহাম্মদ (ﷺ)কে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর; কেননা তা আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (জামে তিরমিযি)

কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে নিম্নের দোআটি পড়ে মৃতদের উদ্দেশ্যে সালাম করতে হয় :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ، اَنْتُم لَنَا سَلَفٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ طَبَعٌ وَ اِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ لَنَا وَ لَكُمْ.

অর্থ : হে কবরস্থিত মুমিন মুসলমান ব্যক্তিগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমরা আমাদের পূর্ব গত হয়েছ। আমরা তোমাদের অনুসরণ করব এবং খোদার হুকুমে তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের প্রতি রহম করুন।

কবর যিয়ারতের নিয়ম হলো কেবলার দিকে পিঠ দিয়ে মৃতের প্রতি মুখ করে দাঁড়ানো এবং মৃতের উদ্দেশ্যে সালাম করা। অতঃপর আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সুরা ফাতিহা, সুরা ইখলাস, সুরা তাকাসুর অথবা কুরআন মাজিদের অন্য যে কোনো সুরা বা আয়াত মুখস্থ থাকলে তা পাঠপূর্বক এগার বার দরুদ শরীফ, ইস্তিগফার পড়ে কবরের দিকে মুখ ফিরিয়ে মুনাজাত দিয়ে সকল কবরবাসীর উপর সাওয়াব বখশিয়ে দেওয়া। অন্যান্য মুনাজাতে কিবলার দিকে ফিরে মুনাজাত দেওয়া মুস্তাহাব। কবর যিয়ারতের ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির দিকে ফিরে মুনাজাত দেওয়া উত্তম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জানাজার সালাত পড়া কী?

ক. ফরজ খ. ফরজে কেফায়া

গ. ওয়াজিব ঘ. সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ

২। জানাজার সালাতে সুন্নত কয়টি?

ক.৩ খ. ৪

গ. ৫ ঘ. ৬

৩। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে যাওয়ার হুকুম কী?

ক. সুন্নত খ. ওয়াজিব

গ. মাকরুহ ঘ. মুস্তাহাব

৪। মৃত্যুর পর মানুষের যে আমল জারী থাকে তা হচ্ছে -

i. সদকায়ে জারিয়া

ii. উপকারী ইলম

iii. নেক সন্তানের দোআ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. iii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মাওলানা আবুল হাশেম জানাজার সালাত পড়াতে গিয়ে তিন তাকবির দিয়ে শেষ করেন।

৫। মাওঃ আবুল হাশেমের সালাত শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. بَاطِلٌ খ. فَاسِدٌ

গ. مَكْرُوْهٌ ঘ. جَائِزٌ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাওম

اَلصَّـوْمُ

প্রথম পাঠ

আহকামুস সাওম

সাওমের পরিচয়

সাওম (اَلصَّـوْمُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। সাওমকে ফার্সি ভাষায় রোযা (روزه) বলা হয়।

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে সর্ব প্রকার পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে, শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলে।

সাওমে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। ক্ষুধার্ত অনাহারী মানুষের দুঃখ কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যা অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়।

সাওম এমন একটি ইবাদত যার অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাই এ বিশেষ ইবাদতের সওয়াব অনির্ধারিত। সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্য, আল্লাহ নিজেই এর প্রতিদান দিবেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِهِ.

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রিপুসমূহকে দমন করার জন্য এ সিয়াম সাধনা সর্বকালীন। হজরত আদম (ﷺ) থেকে সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

সাওমের প্রকার

সাওম পাঁচ প্রকার। **যথা–**

(ক) ফরজ সাওম : যেমন রমযান মাসের সাওম

(খ) ওয়াজিব সাওম : যেমন মান্নতের সাওম

(গ) সুন্নত সাওম : যেমন আশুরার, আরাফার দিনের ও আইয়্যামে বিযের সাওম, শাওয়ালের ছয় সাওম।

(ঘ) নফল সাওম : সোমবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ও শবে বরাতের সাওম।

(ঙ) হারাম সাওম : ইদুল ফিতর, ইদুল আযহা ও ইদুল আযহার পরের তিন দিন সাওম পালন করা হারাম।

সাওম যাদের ওপর ফরজ

রমযান মাসের সাওম পালন করা প্রত্যেক মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও বিবেকবান সুস্থ মানুষের উপর ফরজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপর রমযানের সাওম ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ব পুরুষগণের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সুরা বাকারা, ১৮৬)

রমযান মাসের আমল

১. সাহরি খাওয়া সুন্নত, কমপক্ষে কয়েকটি খেজুর বা এক ঢোক পানি হলেও তা দ্বারা সাহরি গ্রহণ করলে এ সুন্নত আদায় হয়ে যায়।

২. সাওম অবস্থায় সংযমি হওয়া, যেমন : গিবত, মিথ্যাবলা, চোগলখুরী, হাঙ্গামা, রাগ ও বাড়াবাড়ি না করা সুন্নত। এ কাজগুলো সাওম পালনের বাইরেও করা ঠিক নয় তবে সাওম পালনের সময়ে তার থেকে দূরে থাকার বেশি বেশি চেষ্টা করা অপরিহার্য।

৩. সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি ইফতার করা।

৪. ইফতারের দোআ পাঠ করা।

৫. দিনের অধিকাংশ সময় দোআ, দরুদ, আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা।

৬. বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।

৭. রমযানের প্রতি রাতে তারাবির সালাত আদায় করা।

৮. তারাবির সালাতে কুরআন মাজিদ একবার খতম করা বা শ্রবণ করা।

৯. ইতিকাফ করা।

সাহরির পরিচয় ও মর্যাদা

সাহরি (سَحْرِى) শব্দটি আরবি। سَحْرٌ শব্দের অর্থ ভোর রাত। আর سَحْرِىٌّ অর্থ ভোর রাতের খাবার। ইসলামের পরিভাষায় সাওম পালন করার উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা হয়, তাকে সাহরি বলে।

সাহরি খাওয়া সুন্নত। নবি করিম (ﷺ) নিজে সাহরি খেতেন এবং অন্যদেরকেও সাহরি খাওয়ার তাকিদ করতেন। নবি করিম (ﷺ) বলেন–

তোমরা সাহরি খাও কেননা এতে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।

মুসলমানদের সাওম এবং ইয়াহুদি নাসারাদের উপবাসের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তারা সাহরি খায় না, আর মুসলিমগণ সাহরি খায়। সুবহে সাদিক হতে সামান্য বাকি আছে এতোটা বিলম্ব করে সাহরি খাওয়া মুস্তাহাব। তবে সন্দেহের সময় পর্যন্ত দেরি করা মাকরুহ। কোনো কোনো মানুষ মনে করে- আযান না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া জায়েয, এটি একটি মারাত্মক ভুল ধারণা।

ইফতারের পরিচয় ও মর্যাদা

ইফতার (إِفْطَارٌ) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ ভঙ্গ করা, ভেঙ্গে ফেলা। শরিয়তের পরিভাষায় সারাদিন সাওম পালন শেষে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর পর খেজুর, পানি, দুধ, শরবত ইত্যাদি খাবারের মাধ্যমে সাওম ভঙ্গ করাকে ইফতার বলা হয়।

ইফতারের সময় এই দোআ পড়া সুন্নত–

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার জন্য সাওম পালন করেছি এবং আপনার দেওয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।

ইফতার করা সুন্নত। খেজুর বা খুরমা দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। সূর্যাস্তের পরে দেরি না করে ইফতার করা মুস্তাহাব। হাদিসে কুদসিতে আছে: আল্লাহ তাআলা বলেন- আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ বান্দাগণ যারা বিলম্ব না করে ইফতার করে।

অকারণে ইফতারে দেরি করা মাকরুহ। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে সুর্যাস্ত বোঝতে অসুবিধা হলে নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু সময় বিলম্ব করতে হবে।

সাওম পালনকারীকে ইফতার করানো একটি বড় সাওয়াবের কাজ। রসুলে আকরাম (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি কোনো সাওম পালনকারীকে ইফতার করাবে সে ব্যক্তির জন্য তা মাগফিরাত ও

দোযখের আগুণ থেকে মুক্তি লাভের কারণ হবে এবং সে উক্ত সাওম পালনকারীর সমান সওয়াব লাভ করবে। এতে সাওম পালনকারীর সওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না।

সালাতুত তারাবিহ

তারাবিহ (تَرَاوِيْحٌ) শব্দটি আরবি। এটি تَرْوِيْحَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ বিশ্রাম করা, আরাম করা, বসা। শরিয়তের পরিভাষায় মাহে রমযানে ইশার সালাতের পর অতিরিক্ত ২০ রাকয়াত সুন্নত সালাতকে 'সালাতুত তারাবিহ' বলা হয়। এ সালাতকে তারাবিহ নাম রাখা হয়েছে এ জন্যে যে, এতে প্রতি চার রাকায়াত অন্তর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম গ্রহণ করা হয়। তারাবিহ সালাত মুসলমানদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নবি করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

অর্থ : যে ব্যক্তি মাহে রমযানে রাতে ইমানসহ সাওয়াবের আশায় কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়িয়ে তারাবিহ পড়বে, তার অতীতের সমূদয় গুনাহ (সগীরা) মাফ হয়ে যাবে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)।

তারাবিহ সালাত আদায় করা নারী পুরুষ সকলের জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) রাতে সালাত আদায় করছিলেন- সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করে সালাত আদায় করছিলেন। এভাবে তিনদিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অনুসরণে সালাত আদায় করলেন। চতুর্থ রাতে প্রিয় নবি (ﷺ) এ সালাত আদায় করলেন না। কারণ হিসেবে উল্লেখ করলেন–

اِنِّيْ خَشِيْتُ اَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

অর্থ : এই তারাবিহ সালাত তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি, (এ জন্য পড়িনি)।

তারাবিহ সালাতকে প্রিয়নবি (ﷺ) নিজেই সুন্নত ঘোষণা দিয়ে ইরশাদ করেন–

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَ سَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَه، فَمَنْ صَامَه وَ قَامَه اِيْمَانًا وَّ احْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِه كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّه.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের সিয়াম সাধনা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন, আর আমি তোমাদের জন্য সুন্নতরূপে চালু করেছি রমযানের রাতে আল্লাহর ইবাদাতে দাঁড়ানো। কাজেই যে ব্যক্তি এ মাসে সিয়াম সাধনায় আত্মনিয়োগ করবে এবং আল্লাহর সামনে কিয়াম (তারাবিহ) করবে ইমান ও আত্মোপলব্ধির সাথে, সে তার গুনাহ হতে এমন ভাবে নিষ্কৃতি লাভ করবে ঐ দিনের মতো যে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলো। (মুসনাদে আহমদ, সুনানু নাসায়ি)

দ্বিতীয় পাঠ
নফল সাওম

আইয়ামে বিযের সাওম

আইয়ামে বিয (اَيَّـامُ الْبِـيْضِ) এর অর্থ শুভ্র দিবসসমূহ। প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের এ তিন দিনকে একত্রে আইয়্যামে বিয বলা হয়। এ তিনদিন সাওম পালন করা মুস্তাহাব। হজরত কাতাদা (ﷺ) বর্ণনা করেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاْمُرُنَا اَنْ نَّصُوْمَ الْبِيْضَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وَ اَرْبَعَ عَشَرَةَ وَ خَمْسَ عَشَرَةَ قَالَتْ وَ قَالَ هُنَّ كَهَيْاَةِ الدَّهْرِ.

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখের বিযের সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন এ তিনটি সাওম পালনে পুরো বছর নফল সাওম পালনের সওয়াব হয়।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) হজরত আবু যর গিফারী (ﷺ)-কে বলেন, হে আবু যর! যখন তুমি কোনো মাসে তিনদিন সাওম পালন করবে, তখন ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখ সাওম পালন করবে।

(জামে তিরমিযি ও সুনানু নাসায়ি)

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের সাওম

সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা মুস্তাহাব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। হজরত উসামা (ﷺ) বলেন–

اِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ اَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ و يَوْمَ الْخَمِيْسِ.

অর্থ : নবি করিম (ﷺ) সোমবার এবং বৃহস্পতিবার সাওম পালন করতেন। তাঁকে এ দুই দিবসের সাওম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন : বান্দার আমল সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ, ৩৩১)

তিরমিযি শরিফের বর্ণনায় রয়েছে: তিনি বলেন, আমি আশা করি আমার সাওম পালন অবস্থায় আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ হোক।

হজরত আবু কাতাদা (ﷺ) বলেন, হজরত নবি করিম (ﷺ)-কে সোমবারের সাওম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বলেন–

فِيْهِ وُلِدْتُّ وَ فِيْه اُنْزِلَ.

অর্থ : ঐদিন আমার জন্ম হয়েছে এবং ঐ দিনই আমার উপর ওহি নাযিল হয়েছে। (মুসলিম)।

এ হাদিসে প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবি (ﷺ) সাওম পালনের মাধ্যমে তার মিলাদ ও কুরআন অবতীর্ণের স্মৃতিকে মর্যাদাবান করেছেন।

শবে বরাতের সাওম

শাবান চাঁদের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে পবিত্র শবেবরাত। এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা এবং দিনে সাওম পালন করা সুন্নত। এ মর্মে হজরত আলী (ﷺ) বলেন–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا.

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যখন শাবান চাঁদের ১৪তারিখ দিবাগত রাত আসে তোমরা রাত জেগে ইবাদত কর এবং দিনে সাওম পালন কর। (ইবনে মাজা)

এ হাদিসে শবে বরাতকে লাইলুন নিসফি মিন শাবান বলা হয়েছে। এ রাতের ফযিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা হাদিসে রয়েছে।

সুতরাং সকল মুমিন মুসলমানের উচিত, পবিত্র শবে বরাতের সাওম পালন করে ও বেশি বেশি ইবাদত করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করা।

সাওমের কাফ্ফারা

শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ হলে কাযা হবে, আর ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। রমযান ছাড়া অন্য সাওম ভঙ্গ হলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না, তা ভুলক্রমে ভঙ্গ হোক অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করা হোক। রমযানের কাযা সাওম পালন করার সময় তা ভঙ্গ হলে অথবা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা ওয়াজিব হবে না। শুধু রমযানের সাওম ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

যে সমস্ত কারণে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হয়

যে সমস্ত কারণে সাওম ভঙ্গ হলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। সাওম অবস্থায় সুস্থ শরীরে কোনো প্রকার খাদ্যবস্তু ভক্ষণ করলে অথবা ওষুধ সেবন করলে সাওম ভঙ্গ হবে এবং এ প্রকার সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে সাওম ভঙ্গ করলে সাওমের কাযা ও কাফফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

৩। ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পেটে প্রবেশ করালে।

৪। সাওম পালন অবস্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে।

সাওমের কাফফারা আদায়ের পদ্ধতি

সাওম পালন করা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করলে সাওম পালনকারীর উপর অতিরিক্ত জরিমানা স্বরূপ যে কার্য সম্পাদন করতে হয় তাকে কাফফারা বলে। সাওমের কাফফারা হচ্ছেঃ একাধারে বিরতিহীনভাবে ৬০ দিন সাওম পালন করা। মাঝখানে বাদ পড়লে আবার নতুন করে ৬০ টি সাওম পালন করতে হবে। পূর্বের গুলো এর সাথে যোগ করা হবে না।

কারও পক্ষে এরূপ সাওম পালন করা শরিয়ত সমর্থিত ওজরের কারণে সম্ভব না হলে কাফফারার সাওমের পরিবর্তে ৬০ জন মিসকিনকে এক দিনে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে বা সে পরিমাণ খাদ্যের মূল্য গরিব মিসকিনকে দিতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اَوْ اِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-

অর্থ : সে যেন ধারাবাহিক পূর্ণ দুই মাস সাওম পালন করে অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ায়। (সুরা বাকারা ও মুজাদালা)

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা

স্বাস্থ্যবিজ্ঞান দৃষ্টিতে সাওমের উপকারিতা অনেক। এক মাস সাওম পালনের ফলে শরীরের অনেক অঙ্গ প্রতঙ্গের বিশ্রাম ঘটে। প্রতিদিন প্রায় পনের ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামে লিভার, প্লীহা, কিডনী, মূত্রথলীসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ দীর্ঘ সময়ব্যাপী বেশ বিশ্রাম পায়।

সারা বছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাওম পালনে আলসার প্রদাহ উপশম হয়। ফুসফুসে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাঁধার সৃষ্টি হলে সাওম তা দূর করে দেয়। সাওম আলস্য ও গোড়ামি দূর করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সোমবার ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করা কী?

ক. সুন্নত খ. মুস্তাহাব

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

২। ইচ্ছাকৃত একটি সাওম ভঙ্গ করলে কয়টি সাওম রাখতে হয়?

ক. ৩০ খ. ৪০

গ. ৫০ ঘ. ৬০

৩। সাওমের কাযা ও কাফফারা আদায় করতে হয়, যখন কেহ-

i. ইচ্ছাকৃত সাওম ভঙ্গ করে

ii. সাওম অবস্থায় ভুল করে কিছু খায়

iii. অসুস্থ অবস্থায় ঔষধ সেবন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

শাহিদা শবে বরাতের দিনে সাওম রেখেছেন জেনে তার দাদি তাকে সাওম ভঙ্গ করার জন্য বলে।

৫। শাহিদার উক্ত সাওমের হুকুম কী?

ক. ওয়াজিব খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মাকরুহ

৬। এমতাবস্থায় শাহিদার করণীয় হচ্ছে-

i. সাওম পূর্ণ করা

ii. সাওম ভঙ্গ করা

iii. দাদির কথা মান্য করা

৫। রিকাব বা দাস মুক্তকরণ (فِى الرِّقَابِ) : ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দানের বিনিময়ে মুক্তি লাভের সুযোগ সৃষ্টি করলে, যাকাত ফান্ড থেকে সে অর্থ দিয়ে দাস মুক্ত করা যাবে। অথবা যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তাকে মুক্ত করা যাবে।

৬। গারিমিন বা ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করা (اَلْغَارِمِيْنَ) : কেউ বৈধ কোনো কাজে ঋণ করে সে ঋণ শোধ করতে সক্ষম না হলে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে ঋণমুক্ত করা যাবে। অপ্রত্যাশিত কোনো দুর্ঘটনা বা কোনো কারণে ব্যবসা নষ্ট হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

৭। ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় (فِىْ سَبِيْلِ اللهِ) : আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর পথে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৮। ইবনুস সাবিল বা নিঃস্ব পথিক (اِبْنُ السَّبِيْلِ) : মুসাফির বা প্রবাসি লোক স্বদেশে সম্পদ থাকলেও সফরে যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তাহলে তাকেও যাকাত দেওয়া যাবে।

তৃতীয় পাঠ
যার উপর যাকাত ফরজ

ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী যাকাত ফরয হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যাদের উপর যাকাত ফরজ তাদের জন্য শর্ত হলো–

১। মুসলমান হওয়া

২। প্রাপ্ত বয়স্ক (বালেগ) হওয়া

৩। সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হওয়া

৪। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া

৫। ঋণী না হওয়া

৬। পূর্ণ স্বাধীন হওয়া

৭। সম্পদ চন্দ্র মাসের হিসেবে এক বছর কাল স্থায়ী হওয়া

৮। নিসাব পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া : প্রকৃত প্রয়োজন বলতে বোঝায় এমন সব জিনিস যার উপর মানুষের জীবন যাপন ও ইজ্জত আবরু নির্ভরশীল। যেমন : খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ,

বসবাসের ঘর-বাড়ি, পেশাজীবী লোকের পেশা সংক্রান্ত যন্ত্র-পাতি, যানবাহনের পশু, সাইকেল, মোটর ইত্যাদি এ সকল গৃহস্থলি সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উপর যাকাত ফরজ হবে না।

৯। সম্পদ বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিসাব পরিমাণ থাকা।

চতুর্থ পাঠ

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

নির্দিষ্ট সম্পদের মালিক হয়েও যদি কেউ যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পূর্ণ সম্পদ শুধুমাত্র অপবিত্রই হয় না বরং এ জন্য ভয়াবহ পরিণামও অবধারিত রয়েছে। যাকাত আদায় না করার যে কঠিন ও কঠোর পরিণতির কথা কুরআন ও হাদিসে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لاَ يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوْبُهُمْ وَ ظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ.

অর্থ : আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে অথচ তা আল্লাহর পথে (যাকাত) ব্যয় করে না, তাদেরকে শুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে দাগিয়ে দেওয়া হবে তাদের ললাটে, পাঁজরে ও তাদের পৃষ্ঠদেশে। বলা হবে এই সম্পদই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখে ছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করে রাখতে তার স্বাদ গ্রহণ কর। (সুরা তওবা, ৩৪-৩৫)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন–

مَنْ اَتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّيْ زَكَاتَه مُثِّلَ لَه مَالُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعُ لَه زَبِيْبَتَانِ يُطَوَّقُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَاْخُذُ بِلِهْزَمَتَيْهِ يَعْنِيْ شَدَقَيْهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَامَالُكَ وَ اَنَا كَنْزُكَ .

অর্থ : আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত আদায় না করে তাহলে তার সম্পদ কিয়ামতের দিন মারাত্মক বিষধর সর্পের আকার ধারণ করবে, যার কপালের উপর দুটি কালো চিহ্ন কিংবা দুটি দাঁত বা দু'টি শৃঙ্গ থাকবে। কিয়ামতের দিন এ সর্পকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সাপটি তার মুখের দুই পাশে, দুই গালের গোশত খেতে থাকবে আর বলতে থাকবে আমিই তোমার ধন-সম্পদ। আমিই তোমার সঞ্চিত বিত্ত-সম্পত্তি। (সহিহ বুখারি ও নাসায়ি)।

উল্লিখিত আয়াতে কারিমা ও হাদিসে নববির বাণীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় না করার শাস্তি ও পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। তাছাড়া এমন কঠিন শাস্তি অপেক্ষমান যার থেকে পালাবার কোনোই পথ নেই।

পঞ্চম পাঠ
যেসব সম্পদের যাকাত ফরজ

যেসব সম্পদে যাকাত আদায় করা ফরজ হয়, সেগুলো হলো–

১। **স্বর্ণ ও রৌপ্য:** ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৫৩ গ্রাম রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ ১ বৎসর পর্যন্ত যদি মালিকানায় থাকে।

২। **উট, গরু ও ছাগল :** উট কমপক্ষে ৫টি হলে, গরু ৩০টি হলে, ছাগল বা ভেড়া ৪০টি হলে যাকাত ফরয হয়

৩। **ফসল ও ফলের যাকাত :** উৎপাদিত ফসলের যাকাত, যেমন : গম, যব, ছোলা, চাল, ডাল, খেজুর, আলু, যয়তুন ইত্যাদি কম হোক কিংবা বেশি হোক তাতে যাকাত দিতে হবে। সেচের মাধ্যমে হলে ২০ ভাগের এক ভাগ, বৃষ্টির, নদীর বা স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত পানি থেকে উৎপন্ন ফসলের ১০ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

৪। **ব্যবসায় নিয়োজিত অর্থ সম্পদ।**

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। اَلزَّكَاةُ শব্দের অর্থ কী?

ক. বৃদ্ধি পাওয়া খ. কমে যাওয়া
গ. অর্জিত হওয়া ঘ. গ্রহণ করা

২। اَلْغَارِمِيْنَ বলে যাকাতের কোন খাতকে বোঝানো হয়েছে?

ক. দরিদ্র খ. অসহায়
গ. ঋণগ্রস্ত ঘ. মুসাফির

৩। গরুর যাকাতের নিসাব কয়টি?

ক. ২০ খ. ৩০

গ. ৪০ ঘ. ৬০

৪। যাকাত অনাদায়ীর সম্পদ কিয়ামতে তাকে -

i. সাপ হয়ে কামড়াবে

ii. জাহান্নামে নিয়ে যাবে

iii. আগুনের দাগ দিবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

আফযাল সাহেব তার যাকাতের সমুদয় অর্থ মসজিদ নির্মানের কাজে ব্যয় করে বললেন, মসজিদ নির্মাণ সর্বাধিক সওয়াবের কাজ।

৫। শরিয়তের দৃষ্টিতে আফযাল সাহেবের যাকাত আদায় কেমন হল?

ক. صَحِيْحٌ খ. بَاطِلٌ

গ. مُسْتَحَبٌّ ঘ. مَكْرُوْهٌ

৬। আফযাল সাহেবের করণীয় ছিল -

i. যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্র জানা

ii. হকদারকে যাকাত দেওয়া

iii. মা-বাবাকে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

২। খানা-পিনার অপচয় করা কোন ধরণের গুনাহ?

ক. কবিরা খ. সগিরা

গ. শিরকি ঘ. নেফাকি

৩। ধূমপান -

i. একটি বদ অভ্যাস

ii. স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে

iii. অর্থ অপচয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

আসিফ ব্যবসা করতে যেয়ে সুবাস দাসের সাথে সম্পর্ক হয়। একদিন সুবাস তাকে বলি দেওয়া ছাগলের গোশত এনে দেয়।

৪। আসিফের জন্য উক্ত গোশত খাওয়ার বিধান কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৫। এমতাবস্থায় আসিফের করণীয় হচ্ছে -

i. সম্পর্ক বর্জন করা

ii. গোশত না খাওয়া

iii. ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

মকবুল সাহেবের বাড়িতে তার মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠান। তিনি এলাকার নামি দামি সকলকে এ বিয়েতে দাওয়াত দেন। কিন্তু গরিব প্রতিবেশী রজব আলিকে বিয়ের দাওয়াত দেননি। বিয়ের জমকালো আয়োজন দেখে রজব আলির ছোট ছেলে মকবুল সাহেবের বাড়িতে আসলে তার ছেলে আশিক তাকে তাড়িয়ে দেয়।

ক. اَلْأَطْعِمَةُ (আতইমা) শব্দের অর্থ কী?

খ. হারাম খাদ্য ও পানীয়র পরিচয় দাও।

গ. মকবুল সাহেবের কাজটি কেমন হয়েছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মকবুল সাহেবের ছেলে আশিকের কাজটি কেমন হয়েছে আলোচনা কর।

তৃতীয় ভাগ

আখলাক বা চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ

প্রথম অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ

প্রথম পাঠ

উন্নত চরিত্র অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে দুটি বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, একটি মানবিক অপরটি পাশবিক। মানবিক দিককে উন্নত চরিত্র বা اَلْأَخْلَاقُ الْحَسَنَةُ বলে। এর দ্বারা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে। উন্নত চরিত্র অর্জন না করে মানুষ যখন নফস ও শয়তানের কুমন্ত্রনা অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে তখনই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত হয়ে যায় এবং কখনো কখনো তার চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে পৌঁছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ

অর্থ : তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা পথভ্রষ্ট। (সুরা আরাফ, ১৭৯)

তখন তারা হয় মানবকুলের অমানুষ। তাই প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

অর্থ : তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তিই উত্তম যার চরিত্র বা আখলাক সর্বোৎকৃষ্ট। (মিশকাত, ৪৩১)

তাই দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের জন্য প্রতিটি মানুষের সচ্চরিত্রবান হওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্যথায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অপমান, ব্যর্থতার গ্লানি বহন করতে হবে।

উন্নত চরিত্র অর্জনের পদ্ধতি

উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য নিচের গুণাবলি অর্জন করা প্রয়োজন–

১। ইমানের ক্ষেত্রে ইখলাস বা নিষ্ঠা

২। ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক মুক্ত হওয়া ও একাগ্রতা সৃষ্টি

৩। ইহসান তথা যথা সময়ে, যথা নিয়মে ও সর্বোত্তমভাবে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলিতে ভূষিত হওয়া

৪। তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জন

৫। মন মানসিকতায় ভালোকাজের চেতনা সৃষ্টি করা

৬। কৃত অন্যায় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তওবা করা

৭। অতীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আত্মোপলব্ধি সৃষ্টি করা

৮। চিন্তা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সম্পাদন করা

৯। তাওয়াক্কুল বা প্রচেষ্টার পর সবকিছু আল্লাহর নিকট সোপর্দ করা

১০। সবর তথা সর্বাবস্থায় নীতি ও আদর্শে অবিচল থাকা

১১। হায়া বা লজ্জাবোধ থাকা

১২। সততা, সত্যবাদিতা, আমানতদারি, বিনয় প্রকাশ ইত্যাদি মৌলিক গুণাবলি অর্জন করা

১৩। আচরণের ক্ষেত্রে ভদ্রতা, শালিনতা, আদব রক্ষা করা

১৪। উন্নত চরিত্র অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো উন্নত চরিত্রের অধিকারী আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে থেকে সৎ গুণাবলি অনুশীলন ও চরিত্রসমূহ অভ্যাসে পরিণত করা

১৫। সর্বক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসুলের যিকির ও ফিকিরে থাকা

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ ও রসুল (ﷺ)-এর প্রতি মহব্বত

আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, মনিব, রহমান, রহিম, রিযিকদাতা, জান-মাল সবকিছুর একমাত্র মালিক তিনি। এ বিশ্বাস যাদের আছে, আল্লাহর প্রতি তাদের মহব্বত, আল্লাহর রসুলের প্রতি তাদের ভালবাসা হবে অকৃত্রিম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

অর্থ : যারা ইমান এনেছে আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অত্যন্ত প্রবল। (সুরা বাকারা, ১৬৫)

হজরত আলি ইবনে আবু তালিব (রা.) বলেন–

التَّقْوَى هُوَ الْخَوْفُ مِنَ الْجَلِيْلِ وَالْعَمَلُ بِالتَّنْزِيْلِ، وَالرِّضَا بِالْقَلِيْلِ وَالاِسْتِعْدَادُ لِيومِ الرَّحِيل.

অর্থ : তাকওয়া হলো মহান আল্লাহকে ভয় করা, অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী আমল করা, স্বল্পে তুষ্ট থাকা এবং বিদায় দিনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। (দালিলুস সায়েলিন, ১১৪)

তাই আল্লাহর ভয় মনের মধ্যে স্থান দিয়ে পরকালে নিজের কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহিতার কথা চিন্তা করে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবিব সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মুহাব্বতের সাথে কর্মসম্পাদন করাই হবে একজন মুত্তাকির কাজ। আর মুত্তাকির পুরস্কার হল জান্নাত।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ

অর্থ : মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত রয়েছে ।

পঞ্চম পাঠ

ত্যাগ

ত্যাগ (اَلْإِيْثَارُ) বলতে অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণের জন্য নিজে কষ্ট স্বীকার করা এবং তাকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেওয়াকে বোঝায়।

মহানবি (ﷺ)-এর সাহাবিগণের জীবন এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁদের ত্যাগের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

অর্থ : তারা নিজের উপর অন্যান্যদের (প্রয়োজন) কে অগ্রাধিকার দেয়। যদিও তারা রয়েছে অনটনের মধ্যে। (সুরা হাশর, ০৯)।

মহানবি (ﷺ) ও তাঁর সাহাবিগণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে অন্যের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন- ‘ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।’

ষষ্ঠ পাঠ

ক্ষমা

ক্ষমা (اَلْعَفْوُ) শব্দের অর্থ মাফ করা, প্রতিশোধ না নেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে অপরাধীকে মাফ করে দেওয়ার নামই ক্ষমা।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে–

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা মহা ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

ক্ষমা আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ। আল্লাহ তাআলা মানুষকে অগণিত নিয়ামত দান করেছেন। মানুষের সকল সুখ শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু মানুষ মূর্খতাবশত শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর কথা ভুলে যায়। তার হুকুম অমান্য করে, তার সাথে শিরক করে, তার নিআমত অস্বীকার করে। এরপর যখন তারা নিজেদের ভুল বোঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তখন তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন।

সপ্তম পাঠ

বিনয় প্রকাশ

বিনয় (اَلتَّوَاضُعُ) শব্দের অর্থ হলো, অন্যের তুলনায় নিজেকে ছোট জ্ঞান করা এবং অন্যদেরকে বড় মনে করা। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে বিনয়ী হওয়া আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا

অর্থ : রহমানের (আল্লাহর) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিনয়ের সাথে চলাফেরা করে।

(সুরা ফোরকান, ৬৩)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلا رَفَعَهُ اللّٰهُ

অর্থ : কেউ যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বিনয় অবলম্বন করে, তবে মহান আল্লাহ তার মর্যাদাকে বাড়িয়ে দেন। (সহিহ মুসলিম)

বিনয় মুমিনের জিন্দেগির ভূষণ। পক্ষান্তরে অহংকার হচ্ছে পাপীষ্ঠ হওয়ার নিদর্শন।

অষ্টম পাঠ

শিক্ষকের প্রতি আদব

শিক্ষক মানুষের অন্ধকার জীবনে আলোর দিশা দেন। মাতা-পিতা জন্মদাতা হিসেবে সম্মানের পাত্র। কিন্তু, মাতা-পিতা সকলকে মানুষ বানাতে পারেন না। শিক্ষকই মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলেন। আল্লাহ তাআলা হজরত আদম (আ)-কে জ্ঞান দান করে ফেরেশতাদেরকে সে জ্ঞানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা অপারগতা প্রকাশ করায় আদম (আ) তাদেরকে জ্ঞানের কথাগুলো শেখালেন। আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন, আদম (আ)-কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন হিসেবে সেজদা করার। তাই শিক্ষকের প্রতি সম্মান দেখানো নৈতিক দায়িত্ব।

সম্মান প্রদর্শনের কয়েকটি পদ্ধতি হলো–

১. শিক্ষককে পিতৃতুল্য মনে করা।

২. তাঁর আদেশ-নিষেধকে গুরুত্বের সাথে পালন করা।

৩. যথাসাধ্য শিক্ষকের খেদমত করা।

৪. এমন কোনো কাজ না করা বা কথা না বলা যাতে তিনি মনক্ষুণ্ন হন।

৫. শিক্ষকের সামনে কথা বলার সময় বিনয়ের সাথে বক্তব্য উপস্থাপন করা।

৬. শিক্ষক সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আদবের সাথে পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা।

৭. শিক্ষক অসুস্থ হলে তাঁর সেবা করা, অভাবী হলে তাঁকে সাধ্যমত সহায়তা করা।

৮. সবসময় শিক্ষকের জন্য দোআ করা।

হজরত আলী (রা) বলেন–

مَنْ عَلَّمَنِىْ حَرْفاً فَقَدْ صَيَّرَنِى عَبْدًا

অর্থ : যে আমাকে একটি হরফ শিক্ষা দিল সে আমাকে দাসে পরিণত করলো।

(দালিলুস সায়েলীন)

তাই, যার কাছে একটি হরফও শিখবে সেই সম্মানিত শিক্ষক। তার তা'যিম করা, সেবা করা ছাত্রের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

নবম পাঠ

অন্যের ঘরে প্রবেশের অনুমতি

অন্যের ঘরে প্রবেশ করতে অনুমতি গ্রহণ মহান আল্লাহর নির্দেশ ও আদব প্রদর্শনের অন্যতম দিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

অর্থ : হে মুমিনগণ! অন্যের ঘরে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করবেনা। প্রবেশ করার সময় ঘরের বাসিন্দাদের সালাম দেবে। এ আদব প্রদর্শন তোমাদের জন্য উত্তম আচরণ। বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক। (সুরা আন নূর, ২৭)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلإِسْتِيْذَانُ ثَلاَثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَ إِلاَّ فَارْجِعْ

অর্থ : অন্যের ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে প্রথমবার সাড়া না পেলে দ্বিতীয়বার, তাতেও সাড়া না পেলে তৃতীয়বার অনুমতি চাইবে। তৃতীয়বারও সাড়া না পেলে ফিরে আসবে।

অনুমতি চাওয়ার সময় ভেতর থেকে যদি বলে 'কে'? জবাবে নিজের নাম ও পরিচয় বলতে হবে। কলিং বেল থাকলে প্রথমে আস্তে কল করবে। তাতে সাড়া না পেলে আরেকটু জোরে বেল চাপ দিতে হবে, তাতেও সাড়া না পেলে জোরে চাপ দিতে হবে। তাতেও সাড়া না পেলে ফিরে আসতে হবে। বাড়িওয়ালা রাজি না থাকলে জোর করে বিরক্ত করে তার ঘরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

দশম পাঠ

সৎ সঙ্গ লাভ

মানুষ সামাজিক জীব। সে একা থাকতে পারে না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঙ্গী প্রয়োজন। সঙ্গী কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থ : তোমরা সত্যবাদীদের সাথী হও।(সুরা তওবা, ১১৯)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জাহিদ একজন কর্মচারী। সে করিমের পোল্ট্রিফার্মে কাজ করে। সে দীনদার কিন্তু করিম তাকওয়া অবলম্বন করে না। অন্যায় ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে জাহিদের সাথে দুর্ব্যবহার করে। জাহিদের ভুল ঔষধ খাওয়ানোর কারণে দুইশত মুরগী মারা যায়। করিম ভীষণ রাগান্বিত হয়। জাহিদ কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে করিম প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়।

ক. তাকওয়ার হুকুম কী?

খ. উত্তম চরিত্র বা আখলাকে হাসানা বলতে কী বোঝ?

গ. জাহিদের সাথে করিমের দুর্ব্যবহার ও তার ব্যবসা ইসলামের দৃষ্টিতে কীরূপ হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. করিমের ক্ষমা করার বিষটি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. হিশাম ও হোসাইন দাখিল সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। হিশাম ক্লাসে ওস্তাদের দরসে অমনোযোগিতা ও মেজাজ প্রদর্শন করে। হোসাইন সকল শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সে হিশামকে বিনয়ী ও ওস্তাদের সাথে আদব প্রদর্শন করার কথা বলে। হিশাম তা গ্রহণ করেনা। একদা ওস্তাদ হিশামকে বিনয়, আদব, সৎসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নসিহত করেন।

ক. اَلتَّوَاضُعُ কী?

খ. শিক্ষকের আদব কী বুঝিয়ে লেখ?

গ. হিশামের আচরণ ইসলামি শরিয়তে কীরূপ হয়েছে উল্লেখ কর।

ঘ. ওস্তাদের নসিহত কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩. আহসান ও আকরাম এক শ্রেণিতে পড়ে। আকরামের বাবা নেই। মা অনেক কষ্টে সংসার চালান। আকরাম চঞ্চল। প্রায়ই বন্ধুদের বাসায় যায় কিন্তু অনুমতি নেয় না। মোবাইলে অপ্রয়োজনীয় কল করে অর্থ অপচয় করে। আহসান আকরামের আচার আচরণ ও আখলাক পরিবর্তনের কথা বলে। বিপদ-আপদে আকরামের পরিবারকে সহযোগিতা করে। আকরাম এতিম বলে পাশে থাকে, কিন্তু আকরাম আহসানের সাথে ভাল ব্যবহার করে না।

ক. অসচ্চরিত্র কী?

খ. এতিমের প্রতি আচরণ কীরূপ বুঝিয়ে লেখ?

গ. আকরামের আচরণ শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে?

ঘ. আহসানের আচরণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অসচ্চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ الذَّمِيْمَةُ

প্রথম পাঠ

বিদ্রূপ করা

বিদ্রূপ করাকে আরবিতে (اَلسِّخْرِيَّةُ) বলে। বিদ্রুপ করা নিঃসন্দেহে একটি নিন্দনীয় কাজ। ইসলাম আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করেছে। অহংকারবশত অন্যকে ঘৃণা করা কিংবা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা নিষিদ্ধ ও গর্হিত কাজ। কাউকে হেয় করার ইচ্ছায় বিদ্রূপ করাকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অধিকার বিনষ্ট হয় এবং সম্মানহানী হয়। মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَلاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ.

অর্থ : কোনো সম্প্রদায় অন্য কোনো সম্প্রদায়কে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে না। (সুরা হুজুরাত, ১১)

যাকে বিদ্রূপ করা হয়, সে আল্লাহর নিকট বিদ্রূপকারীর অপেক্ষাও প্রিয়তর হতে পারে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) কখনো কাউকে বিদ্রূপ করেন নি। তিনি অন্যের ত্রুটি না খোঁজার জন্য শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

وَ لاَ تَحَاسَدُوْا وَ لاَ تَبَاغَضُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا.

অর্থ : তোমরা পরস্পরে হিংসা পোষণ করো না, পরস্পরে রাগারাগি করো না। তোমরা আল্লাহর বান্দা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও। (সহিহ বুখারি)

মূলকথা, বিদ্রূপ করার কুফল থেকে ব্যক্তি ও সমাজ মুক্ত হলে শান্তি আসে। কাউকে বিদ্রূপ না করে মানবিক মর্যাদা দান করাই মনুষ্যত্ব।

দ্বিতীয় পাঠ

কৃপণতা

কৃপণতা (اَلْبُخْلُ) মানব চরিত্রের একটি মারাত্মক রোগ। যে রোগ সুস্বাস্থ্য, বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সমাজে মানুষকে হেয় করে, মান-সম্মানে আঘাত হানে।

আল্লাহ তাআলা বখিলদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه فَاُلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ. وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اٰتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থ : আর যারা নিজ নিজ আত্মাকে কার্পণ্য থেকে মুক্ত করতে পেরেছে তারাই কল্যাণ পথের পথিক। তোমরা কখনও এরূপ ধারণা করোনা যে, যারা আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর ও অমঙ্গল জনক। কিয়ামত দিবসে তারা যে বস্তুতে কার্পণ্য করেছে তা তাদের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (সুরা আলে ইমরান, ১৮০)

হজরত আবু বকর সিদ্দিক (ﷺ) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রসুল (ﷺ) বলেন–

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَ لاَ بَخِيْلٌ وَّ لاَ مَنَّانٌ.

অর্থ : ধোকাবাজ, কৃপণ, এবং উপকার করে খোটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

শেখ সাদী (ﷺ) তাই বলেন–

بهشتی نباشد بحکم خبر *بخیل ار بود زاهد بحر و بر .

বাখিল আর বুওয়াদ যাহেদ বাহরও বার * বেহেশতি না বাশাদ বে হুকমে খবর।

কৃপণ জগত সেরা জাহেদ-আবেদ হলে * বেহেশ্‌ত পাবে না তবু হাদিসেতে বলে।

এ কার্পণ্য রোগের চিকিৎসা করতে হবে নিম্নরূপ পদক্ষেপের মাধ্যমে–

১। নিজের কামনা-বাসনা লোভ সংযত করতে হবে।

২। মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে হবে।

৩। যেসব বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মৃত্যু বরণ করেছেন, তারা যে কোনো সম্পদ কবরে নিয়ে যেতে পারেননি তা নিয়ে চিন্তা ফিকির করতে হবে।

৪। বেশি বেশি কবর যিয়ারত করতে হবে।

তৃতীয় পাঠ
রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা (اَلرِّيَاءُ) একটি নিন্দনীয় গুণ। একজন ইমানদারের কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা সব কিছু হতে হবে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আত্মপ্রচার, লোক দেখানো ইবাদত বা কর্মে কোনো মূল্য নেই। রিয়া বা লোক দেখানো ইবাদত ও কর্মে ইখলাস ও আন্তরিকতা থাকে না। এসব ইবাদত ও কর্মের দ্বারা আল্লাহর ভয় ও রসুল (ﷺ) এর মহব্বত হাসিল হয় না।

আল্লাহ তাআলা রিয়াকারীদের অভিশম্পাত করে বলেন–

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ.

অর্থ: সুতরাং ধ্বংস ঐ সকল সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। (সুরা মা'ঊন, ৪-৬)

হজরত নবি করিম (ﷺ) বলেন– আল্লাহর নিকট 'জুব্বুল হুযন' হতে আশ্রয় ও মুক্তি প্রার্থনা কর। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন- 'জুব্বুল হুযন' কী? রসুলে করিম (ﷺ) জবাবে বলেন, 'জাহান্নামের একটি প্রান্তর যা রিয়াকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

রিয়া বলতে সহজে বোঝতে হবে যে, ব্যক্তি কোনো নেক আমল করার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য পোষণ করবে যে, লোকে তার এ সমস্ত আমল দেখুক, মানুষের মধ্যে তার সম্মান প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাক। রিয়া চাল-চলনে হতে পারে, কথা ও কাজে হতে পারে।

রিয়া থেকে বাঁচার উপায় নিজেকে আল্লাহর একজন নিকৃষ্ট বান্দা মনে করা। মৃত্যুর ভয় মনে সদা জাগরূক রাখা, লোক দেখানো ইবাদত যে কবুল হবে না বরং জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে তা মনে প্রাণে ভালোভাবে উপলব্দি করা।

চতুর্থ পাঠ
গিবত বা পরনিন্দা

গিবত (اَلْغِيْبَةُ) শব্দটি غَيْبٌ থেকে উৎসারিত। এর শাব্দিক অর্থ হলো অনুপস্থিত থাকা। গিবত শব্দের অর্থ কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা, যদিও তার মধ্যে উক্ত দোষটি বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে তাঁর এমন দোষের কথা বলা, যা শুনলে মনে কষ্ট পাবে বা লজ্জা পাবে। গিবত শ্রবণকারী, তাতে মনোযোগ প্রদানকারী, উৎসাহ প্রদানকারী সকলেই গিবতকারীর সমপরিমাণ গুনাহগার হবে।

গিবতের অপকারিতা

গিবত সামাজিক সুখ শান্তি বিনষ্ট করে। পরস্পরের মধ্যে ভাল সম্পর্কের অবনতি ঘটায়। বন্ধুত্ব নষ্ট করে, পরস্পরের আস্থা বিনষ্ট হয়, সমাজে কলহ, ঝগড়া-বিবাদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। ইসলামি শরিয়াতে গিবত কবিরা গুনাহ ও হারাম। আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত ভক্ষণ করা যেমন জঘন্য, গিবত করাও তেমনি জঘন্য ও ঘৃণার কাজ।

তৃতীয় অধ্যায়

দোআ ও মুনাজাত

اَلدُّعَاءُ وَالْمُنَاجَاتُ

প্রথম পাঠ

কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে দোআ

দোআ (اَلدُّعَاءُ) শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা বা চাওয়া ,প্রার্থনা করা। দোআ হলো আদবের সাথে কাকুতি মিনতিসহ আল্লাহর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে, এগুলোকে মাসনূন দোআ বলা হয়।

কুরআনের আলোকে দোআ

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُوْنِىْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সুরা মুমিন, ৬০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَ اِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

অর্থ : আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই- যখন সে আমাকে আহ্বান করে।

(সুরা বাকারা, ১৮৬)

হাদিসের আলোকে দোআ

রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

অর্থ : দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ। (মিশকাত, ১৯৫)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

مَنْ فُتِحَ لَه بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَه اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

অর্থ : যার জন্য দোআর দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।

(মিশকাত, ১৯৫)

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বহু দোআ শিখিয়েছেন। তার মধ্যে একটি এরূপ–

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : হে আমাদের রব! আমাদের এই আমল কবুল করুন, নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।
(সুরা বাকারা, ১২৭)

দ্বিতীয় পাঠ
কতিপয় প্রয়োজনীয় দোআ

ঘরে প্রবেশ করার দোআ :

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِاسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَ بِاسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَ عَلَى اللهِ ربنا تَوَكَّلْنَا .

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম প্রবেশকারী ও সর্বোত্তম প্রস্থানকারী হতে চাই, আল্লাহর নামে আমি প্রবেশ করি ও আল্লাহর নামে আমি বের হই এবং আমাদের প্রভু আল্লাহর উপরই তাওয়াককুল করি।

ঘর থেকে বের হবার দোআ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ.

অর্থ : আল্লাহর নামে (রওয়ানা করছি), আল্লাহর উপর ভরসা করছি, আল্লাহ ছাড়া (আমাদের) কোনো উপায় ও শক্তি নেই।

স্থল পথে যানবাহনে আরোহণের দোআ :

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থ : পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এসব কিছুকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে এনে দিয়েছেন। যদিও আমার এতে সামর্থবান ছিলাম না। এভাবেই আমরা সবাই আমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য।

নৌপথে আরোহণের দোআ :

নদী পথের যানবাহনে (লঞ্চ/স্টিমার ইত্যাদি) আরোহণের সময় পড়তে হয়–

بِسْمِ اللهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّـي لَـغَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থ : আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

মেধাশক্তি বৃদ্ধির দোআ :

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا.

অর্থ : হে আমার রব! আমার ইলম বৃদ্ধি করে দিন। (সুরা ত্বাহা, ১১৪)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِى وَيَسِّرْ لِي اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِي

অর্থ : হে রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ সহজ করে দাও। আমার জবানের বদ্ধতা খুলে দাও। আমার কথা বোঝার মতো করে দাও।

বদ নযর থেকে সুরক্ষার দোআ :

বদ নযর সত্য। সাপের বিষ থেকে বদ নযর মারাত্মক। তাই বদ নযর দেখা দিলে নিম্নের আয়াতদ্বয় পড়ে ফুঁ দিতে হয়–

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

অর্থ : এবং তোমরা যা দান কর অথবা মানত কর সে সব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন। আর অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعلَمِيْنَ

এ আয়াত পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তিকে দম দিলে সে আরোগ্য লাভ করে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الدعاء শব্দের অর্থ কী?

ক. আরাধনা করা খ. ডাকা বা চাওয়া
গ. প্রার্থনা করা ঘ. আলোচনা করা

২. الدُعَاء المَسنُون কী?

ক. সুন্নত সমর্থিত দোআ
খ. হাদিসের ভাষ্যে প্রাপ্ত দোআ
গ. কুরআন বর্ণিত দোআ
ঘ. রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে

৩. দোআ হল-

i. কারও কাছে কোনো কিছু চাওয়া

ii. বুযুর্গানে দীনের নিকট চাওয়া

iii. আল্লাহর কাছে চাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

ফররুখ সালাত পড়ে তাড়াহুড়া করে উঠে চলে গেল। তার বন্ধু ফাহিম বলল, তুমি দোআ করো না কেন? ফররুখ বলল, সালাত পড়েছি, আর দোআর দরকার কী?

১. ফররুখ এর কাজটি শরিয়তের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

২. ফররুখের উচিত ছিল-

i. দোআ করা

ii. তওবা ও ইস্তেগফার করা

iii. যিকির করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাহান ও শরিফ একত্রে জামাতে সালাত আদায় করছে। সালাম ফিরানোর পর সাহান মাসনুন দোআ পাঠ করে ইমামের সাথে হাত উঠিয়ে দোআ করে। কিন্তু শরিফ চুপ করে বসে থাকে। তাকে দোআ পাঠ করতে বললে সে অস্বীকার করে এবং বলে, সালাতই দোআ।

ক. সালাতের পর দোআর হুকুম কী?

খ. সালাতের পর দোআর নিয়ম লেখ?

গ. শরিফের মনোভাব শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাহানের মনোভাব কুরআন সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০২০
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৭ম-আকাইদ

প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ইল্‌ম অর্জন ফরজ
– আল হাদিস

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত